০৭/১২-০৩

ISSN 1605-7023

সপ্তম বর্ষ সংখ্যা

কার্তিক ১৪০৯, নভেম্বর-২০০২

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা

LIBRARY JOURNAL

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

সাভার, ঢাকা।

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা

সপ্তম বর্ষ সংখ্যা কার্তিক ১৪০৯

সম্পাদনা পর্ষদ

ডঃ কামাল উদ্দিন সিদ্দিকী	চেয়ারম্যান
ড. মুহম্মদ মাহবুবুর রহমান	সদস্য
সৈয়দ আতাউর রহমান	সদস্য
মোশারফ হোসেন	সদস্য
এ,কে,এম নাসিরুল হক	সদস্য
ডঃ মীর ওবায়দুর রহমান	সদস্য
সৈয়দ শামসুল আলম	সদস্য

সম্পাদক ঃ বণিক গৌর সুন্দর

সৌজন্য সংখ্যা

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা, সপ্তম বর্ষ সংখ্যা কার্তিক ১৪০৯
Bangladesh Lok-Proshashon Patrika, 7th Year Issue, Kartik, 1409
বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের বার্ষিক বাংলা পত্রিকা
Annual Bengali Journal of Bangladesh Public Administration Training Centre

© বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশকাল ঃ জ্যৈষ্ঠ ১৪১০, সেপ্টেম্বর, ২০০৩

পি এ টি সি গ্রন্থাগার ঃ ০৫০.৩৫

টেলিফোন	ঃ	৭৭১০০১০-১৫ (পিএবিএক্স)
ফ্যাক্স	ঃ	৭৭১০০২৯
ই-মেইল	ঃ	bpatc@sdnbd.org
ওয়েব	ঃ	www.bpatc.org

গ্রাহক হওয়ার জন্য
যোগাযোগ-এর ঠিকানা ঃ

প্রকাশনা কর্মকর্তা
বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা-১৩৪৩।

বিনিময়	ঃ	১৬০.০০ টাকা মাত্র
মুদ্রণে	ঃ	ইছামতি অফসেট প্রেস ১/১ ডিআইটি রোড, হাজীপাড়া, ঢাকা- ১২১৭।

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধসমূহের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধকারদের। প্রবন্ধে প্রকাশিত মতামত প্রবন্ধকারদের একান্ত নিজস্ব এবং এর জন্য সম্পাদনা পরিষদ কোন দায়িত্ব বহন করে না।

সূচিপত্র

বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ ও প্রযুক্তির স্থানান্তর : বাংলাদেশ প্রেক্ষিত ১
মোহাম্মদ আবদুল্লাহ

মধ্যস্বত্ব* অধিগ্রহণ ও বাংলাদেশে সামাজিক পরিবর্তন ২৫
মোঃ মাহমুদ হাসান

বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ঃ একটি আলোচনা ৪১
আনিসুর রহমান খান

বাংলাদেশে বাল্যবিবাহের স্বরূপ ও ফলাফল ঃ একটি সমীক্ষা ৫৭
মোহাম্মদ জুলফিকার হোসেন
মোহাম্মদ সেলিম

বাংলাদেশের লবণাক্ত অঞ্চলের কৃষি ঃ অতীত ও বর্তমান ৭৩
মল্লিক আনোয়ার হোসেন

ঢাকা মহানগরের পরিবেশ দূষণ : একটি পর্যালোচনা ৮৭
ব্যোমকেশ তালুকদার

যুক্তরাষ্ট্রের কতিপয় স্থাপনায় সন্ত্রাসী হামলা ও বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এর প্রভাব : একটি বিশ্লেষণ ১১৫
প্রদীপ কুমার পাণ্ডে

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা
৭ম বর্ষ সংখ্যা কার্তিক ১৪০৯

বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ ও প্রযুক্তির স্থানান্তর: বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

মোহাম্মদ আবদুল্লাহ*

Foreign Direct Investment and Technology Transfer: Bangladesh Perspective

Mohammed Abdullah

Abstract : Foreign Direct Investment (FDI) is considered to be one of the most important channels of modern technology to the developing countries. But this mechanism does not always facilitate effective transfer of technology. The possession of unique technologies is a source of monopolistic advantage. So Multinational Corporations (MNCs) are not willing to pass on such wealth-creating asset to the local people working in their subsidiaries in developing countries. They tend to maintain strict confidentiality and reservation about technology so that access of local people to it can be kept at minimum level. So in order to induce the MNCs to transfer technology more effectively, it is necessary to adept some incentive-based and control–based policies and strategies. The objective of this paper is to suggest some such policies. In addition, this paper will identify some other factors that are acting as deterrent on the way of inflow of FDI and recommend some measures that can be adopted to strengthen the inflow into Bangladesh, which is a pre-requisite for strengthening technology transfer process through FDI.

১। ভূমিকা ঃ

বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগকে অনুন্নয়নশীল বিশ্বের জন্য আধুনিক প্রযুক্তি সংগ্রহের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এক হিসেব অনুসারে প্রযুক্তি সংগ্রহের জন্য বিশ্বে সর্বমোট যে পরিমাণ রয়্যালটি ও ফি প্রযুক্তি গ্রহণকারী কোম্পানীগুলো পরিশোধ করে তার শতকরা প্রায় আশিভাগ পরিশোধিত হয় বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের মাধ্যমে প্রাপ্ত প্রযুক্তির জন্য (UNCTAD, 1995)। এ থেকে সহজেই উপলব্ধি করা যায় বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ (Foreign Direct Investment বা FDI) উন্নত বিশ্ব থেকে উন্নয়নশীল বিশ্বে প্রযুক্তি স্থানান্তরে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

---

* সহকারী অধ্যাপক, ইনষ্টিটিউট অব এপ্রোপ্রিয়েট টেকনোলজী, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

যদিও বৈদেশিক বিনিয়োগ প্রযুক্তি স্থানান্তরের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম, এই পদ্ধতিতে প্রযুক্তি স্থানান্তর স্বতঃস্ফূর্ত বা স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঘটেনা। প্রযুক্তি হচ্ছে আন্তর্জাতিক বাজারে তুলনামূলক সুবিধা অর্জনের এবং প্রতিযোগিতা করার ক্ষমতা বৃদ্ধির চাবিকাঠি। কাজেই বহুজাতিক কোম্পানীগুলো স্বেচ্ছায় কখনই এই চাবিকাঠি বিনিয়োগ গ্রহীতা দেশের হাতে তুলে দেবে না। উন্নয়নশীল দেশে তাদের বিনিয়োগের মূল উদ্দেশ্য হল এসব দেশের সস্তা মানব সম্পদ ও প্রাকৃতিক সম্পদের সুযোগ নেয়া ও স্থানীয় বাজারে প্রবেশের মাধ্যমে নিজেদের বাজার সম্প্রসারণ করা। কাজেই উন্নয়নশীল দেশগুলোর বিনিময়ে এসব বহুজাতিক কোম্পানীর মাধ্যমে দেশে যাতে প্রযুক্তির প্রবাহ বৃদ্ধি পায় এবং স্থানান্তর ত্বরান্বিত হয় সে চেষ্টা করা উচিত। এজন্য সরকার যুগপৎভাবে নিয়ন্ত্রণমূলক এবং আর্থিক উৎসাহ ভিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।

এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের দেশে বৈদেশিক বিনিয়োগ থেকে প্রযুক্তি সংগ্রহের প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে আলোচনা করা এবং বৈদেশিক বিনিয়োগকে নিয়ন্ত্রণ করে বা আর্থিক উৎসাহ প্রদান করে দেশে কিভাবে প্রযুক্তির সরবরাহ জোরদার ও ত্বরান্বিত করা যায় সে সম্পর্কে সুপারিশমালা প্রণয়ন।

এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে নিবন্ধকে ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। পরবর্তী অধ্যায়ে বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের মাধ্যমে প্রযুক্তির কিভাবে স্থানান্তর ঘটে তা আলোচনা করা হয়েছে। ৩য় অধ্যায়ে প্রযুক্তি স্থানান্তরে বহুজাতিক কোম্পানীর ভূমিকার মূল্যায়ন করা হয়েছে। ৪র্থ অধ্যায়ে দেশে প্রযুক্তির চাহিদা পূরণে বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ৫ম অধ্যায়ে দেশে এর মাধ্যমে কিভাবে প্রযুক্তির স্থানান্তর উৎসাহিত করা যায় সে সম্পর্কে কিছু কৌশল ও নীতিমালা সুপারিশ করা হয়েছে। সর্বশেষে উপস্থাপিত হয়েছে উপসংহার।

২। বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের মাধ্যমে কিভাবে প্রযুক্তির স্থানান্তর ঘটে?

বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের (FDI) মাধ্যমে কিভাবে প্রযুক্তির স্থানান্তর (transfer) ঘটে তা আলোচনার আগে প্রযুক্তি বলতে কি বুঝায় তা সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক। UN-ESCAP/APCTT (1987) প্রযুক্তিকে চারটি উপাদানের সমন্বয় হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছে। এগুলো হলঃ যন্ত্রপাতি, (technoware), দক্ষতা (humanware), তথ্য (inforware) এবং প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা (orgaware)। যন্ত্রপাতি (technoware) হল মেশিন, ইন্স্ট্রুমেন্ট ইত্যাদি, যেগুলো সরাসরি কাঁচামালকে পণ্যতে রূপান্তরের কাজ করে। দক্ষতা (humanware) হচ্ছে এই রূপান্তরের জন্য মানুষের (শ্রমিক ও ব্যবস্থাপকের) যে অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ইত্যাদির দরকার হয় তা। তথ্য (inforware) হচ্ছে পণ্য ও মেশিনের গঠন প্রণালী বোঝার জন্য ও মেশিন চালানোর জন্য যে তথ্য ও উপাত্তের দরকার হয়, যেমন- ম্যানুয়াল,

চার্ট, ডিজাইন, স্পেসিফিকেশন, গাইড ইত্যাদি। আর প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা (orgaware) হচ্ছে উৎপাদনের উপকরণ ও প্রযুক্তির অন্যান্য উপাদানকে সংঘবদ্ধ বা একত্রিত করে উৎপাদন পরিচালনা করার ক্ষমতা বা দক্ষতা। প্রযুক্তির এই উপাদানগুলো একটি অন্যটির পরিপূরক এবং কোন একটির সম্পূর্ণরূপ অনুপস্থিতিতে উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালিত হতে পারে না।

বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের মাধ্যমে প্রযুক্তির উল্লেখিত চারটি উপদানই সরাসরি কমবেশী বিনিয়োগ গ্রহীতা অর্থনীতিতে স্থানান্তরিত হয়। যন্ত্রপাতি (technoware) এর সাথে সাথে কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা (humanware) দাতা দেশ থেকে গ্রহীতা দেশে প্রবেশ করে। এছাড়াও বৈদেশিক বিনিয়োগ মেশিন ও যন্ত্রপাতি তৈরীর ও পরিচালনার ম্যানুয়াল, ডিজাইন, ড্রয়িং স্পেসিফিকেশন ইত্যাদি (inforware) গ্রহীতা দেশে প্রেরণ করে এবং উৎপাদনের উপকরণগুলোকে সংঘবদ্ধ করার জন্য দক্ষতা (orgaware) গড়ে তুলতেও ভুমিকা রাখে।

প্রযুক্তি উল্লিখিত উপায়ে বৈদেশিক বিনিয়োগ গ্রহীতা দেশে প্রত্যক্ষভাবে স্থানান্তরিত হয়। পরবর্তীতে প্রযুক্তির এই স্থানান্তর থেকে স্থানীয় অর্থনীতিতে প্রযুক্তির স্থানান্তর (diffusion) ঘটে দুটো উপায়ে। প্রথমতঃ প্রযুক্তি সংগ্রহকারী ফার্ম প্রযুক্তিটি স্থানীয় অন্যান্য ফার্মের নিকট বিক্রয় করতে পারে বা রয়েলটি বা ফি এর বিনিময়ে ব্যবহারের সুযোগ দিতে পারে। একে উল্লম্ব পতন (vertical spillover) প্রক্রিয়া বলা হয়। দ্বিতীয়তঃ কোন আর্থিক লেনদেন ছাড়াই কখনও কখনও প্রযুক্তি গ্রহীতা ফার্মের নিকট থেকে স্থানীয় ফার্ম ও সরবরাহকারীদের নিকট প্রযুক্তির স্থানান্তর ঘটে। প্রযুক্তির এরূপ স্থানান্তরকে প্রযুক্তির পতন (technological spillover) বলে।

প্রযুক্তির পতন (technological spillover) প্রক্রিয়া দু'ধরনের। অনুভূমিক পতন (horizontal spillover) প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রযুক্তি গৃহীতা ফার্মের অগোচরে গৃহীত প্রযুক্তিটি এক বা একাধিক ফার্ম আয়ত্ব (copy) করে ফেলে এবং প্রযুক্তিটি প্রায় বিনা খরচায় অর্জন করে। অন্যদিকে উল্লম্ব পতন (vertical spillover) প্রক্রিয়া এর ক্ষেত্রে প্রযুক্তি গ্রহীতা ফার্ম যে সব ফার্ম তাদের ইনপুট সরবরাহ করে তাদেরকে বিনামুল্যে প্রযুক্তি সরবরাহ করে। বহুজাতিক কোম্পানীগুলো স্থানীয় সরবরাহকারীদের (suppliers/sub-contractors) প্রযুক্তিগত সহায়তা ও ট্রেনিং এর ব্যবস্থার এর মাধ্যমে এই প্রক্রিয়ায় প্রযুক্তির স্থানান্তর ঘটায় (WTO, 1996)|

অনুভূমিক পতন (horizontal spillover) বিভিন্ন উপায়ে ঘটতে পারে। প্রথমতঃ বিদেশী ফার্মে কর্মরত দক্ষ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা যখন চাকুরি ছেড়ে স্থানীয় ফার্মে যোগদান করে বা নিজেরা নতুন (spin off) ফার্ম গড়ে তোলে। দ্বিতীয়তঃ স্থানীয় সরবরাহকারী ফার্মগুলো যখন বিদেশী ফার্মের সংস্পর্শে আসে তখন তারা বিদেশী

ফার্মগুলোর কাছ থেকে উৎপাদন প্রক্রিয়া সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে। এর ফলে তারা অনুকরণ (imitation) ও অনুকরণ প্রকৌশল (reverse Engineering) এর মাধ্যমে প্রযুক্তিটি আয়ত্ব করে ফেলে। তৃতীয়তঃ বহুজাতিক কোম্পানীগুলো স্থানীয় সরবরাহকারী ফার্মগলোর উপর পণ্যের গুণগত মান উন্নয়ন ও ব্যয় হ্রাসের জন্য চাপ সৃষ্টি করে এদের প্রযুক্তিগত ক্ষমতা বৃদ্ধি করে (UNCTAD, 1995)|

অনুভূমিক পতন (horizontal spillover) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রযুক্তি বিশেষত: নিচে উল্লেখিত এক বা একাধিক পন্থায় বহুজাতিক কোম্পানীর কাছ থেকে স্থানীয় সরবরাহকারী শিল্প কারখানার নিকট পৌঁছে যায়ঃ

(ক) পণ্যের ডিজাইন, স্পেসিফিকেশন ও গুণগতমান সম্পর্কে সরবরাহকারী ফার্মকে বহুজাতিক ফার্মের দেয়া নির্দেশনা,

(খ) নমুনা পণ্য তৈরী ও মূল্য প্রকৌশল (value engineering) পর্যায়ে সরবরাহকারী ফার্মের অংশগ্রহণ,

(গ) ক্রেতা ফার্মের প্রতিদ্বন্দ্বী ফার্মগুলোর উৎপাদিত পণ্যের প্রযুক্তি ও বাজার সম্পর্কে সরবরাহকারী ফার্মকে ক্রেতা ফার্ম প্রদত্ত তথ্য ও উপাত্ত,

(ঘ) ক্রেতা ও সরবরাহকারী ফার্মের কর্মীদের মধ্যে প্রযুক্তিগত বিষয়ে তথ্য ও জ্ঞানের অপ্রাতিষ্ঠানিক বিনিময় এবং

(ঙ) ক্রেতা ফার্মের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সংস্পর্শে আসার সুযোগ লাভের কারণে এর প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সরবরাহকারী ফার্মের লব্ধ জ্ঞান।

এছাড়া যদিও বহুজাতিক ক্রেতা ফার্মগুলো সরবরাহকারী স্থানীয় ফার্মগুলোকে প্রত্যক্ষভাবে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি সরবরাহ করে না, কিন্তু পণ্যের গুণগত মান সম্পর্কে তাদের চাহিদা ও শর্ত এসব সরবরাহকারী ফার্মের প্রযুক্তিগত ক্ষমতা বৃদ্ধি করে বা উন্নত প্রযুক্তি সংগ্রহে বাধ্য করে। উদাহরণস্বরূপ ক্রেতা ফার্মগুলোর নিম্নোক্ত ধরনের সহায়তা সরবরাহকারী ফার্মগুলোর প্রযুক্তিগত ক্ষমতা বৃদ্ধিতে ব্যাপক ভূমিকা রাখেঃ

(ক) পণ্যের গুণগত মান সম্পর্কে মূল্যায়ন।

(খ) বর্তমান গুণগত মান সম্পর্কে উপদেশ ও ভবিষ্যৎ গুণগত মান সম্পর্কে আগাম দিক নির্দেশনা এবং

(গ) যে কোন কারিগরি সমস্যা সমাধান বিশেষজ্ঞের সহায়তা।

এছাড়াও ক্রেতা বহুজাতিক ফার্মগুলো স্থানীয় সরবরাহকারী ফার্মগুলোকে উন্নত প্রযুক্তি গ্রহণের জন্য অধিকতর বিনিয়োগ করতে বিশেষ ভূমিকা রাখে। ক্রেতা ফার্ম স্থানীয় ফার্মের নিকট থেকে বিপুল পরিমাণ কাঁচামাল ক্রয়ের ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিক্রেতা ফার্মকে বিপুল পরিমাণে বিনিয়োগে উৎসাহিত করে। ক্রেতা ফার্মের

উচ্চমান সম্পন্ন পণ্যের চাহিদা ও বিপুল পরিমাণ ক্রয়ের প্রতিশ্রুতি স্থানীয় ফার্মগুলোকে ব্যাপক বিনিয়োগের মাধ্যমে উন্নত প্রযুক্তি ও প্রযুক্তিগত ক্ষমতা আয়ত্ব করতে বাধ্য করে। এভাবে বহুজাতিক ক্রেতা ফার্মগুলোর কাঁচামাল ক্রয়ে উচ্চ গুণগতমানের শর্ত ও বিপুল পরিমাণ ক্রয়ের প্রতিশ্রুতি স্থানীয় ফার্মগুলোর প্রযুক্তিগত ক্ষমতা বাড়াতে ব্যাপক ভূমিকা রাখে।

উল্লম্ব পতন (vertical spillover) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিচের এক বা একাধিক উপায়ে সরাসরি প্রযুক্তি বহুজাতিক ক্রেতা ফার্মের কাছ থেকে স্থানীয় সরবরাহকারী ফার্মের নিকট স্থানান্তরিত হয়ঃ

(ক) প্লান্টের ডিজাইন, প্রস্তুত, যন্ত্রপাতি নির্বাচন ও উৎপাদন পরিকল্পনা সম্পর্কে ক্রেতা ফার্মকে উপদেশ প্রদান,

(খ) গুণগতমান তথা ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে উপদেশ বা ট্রেনিং প্রদান,

(গ) উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট গোলযোগ মোকাবেলায় কারিগরি সহায়তা প্রদান,

(ঘ) উৎপাদনের জন্য মেশিন ও যন্ত্রপাতি সাময়িকভাবে ধার দেয়া বা স্থায়ীভাবে দিয়ে দেয়া এবং

(ঙ) সরবরাহকারী ফার্মের কার্মচারীদের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া।

বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের কারণে যখন বহুজাতিক কোম্পানীগুলোর সাথে কাঁচামাল/যন্ত্রপাতি সংগ্রহের মাধ্যমে স্থানীয় সরবরাহকারী শিল্পকারখানাগুলোর প্রত্যক্ষ যোগযোগ স্থাপিত হয়, তখন স্থানীয় শিল্পকারখানাগুলো বহুজাতিক কোম্পানীর কাছ থেকে ধাপে ধাপে প্রযুক্তি সম্পর্কে শিক্ষালাভ করে এবং এক পর্যায়ে প্রযুক্তিটি সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ব করে ফেলে। সরবরাহকারী শিল্পকারখানাগুলো প্রথমে মূল যন্ত্রাংশ নির্মাতা (Original Equipment Manufacturing OEM) ফার্ম হিসেবে তাদের উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করে। পরবর্তীতে তারা প্রযুক্তি কিছুটা আয়ত্ব করে যখন নিজেরাই ডিজাইন তৈরীতে সক্ষম হয় তখন তারা নিজস্ব ডিজাইনে নির্মাতা (Own Design and Manufacturing ODM) ফার্ম হিসেবে আত্ম প্রকাশ করে। এর কিছু সময় পর যখন তারা প্রযুক্তির দিক থেকে আরও স্বাবলম্বী হয় এবং উৎপাদিত পণ্য নিজেরাই বাজারজাত করার ক্ষমতা অর্জন করে তখন তারা নিজস্ব ব্রান্ড নির্মাতা (Own Brand and Manufacturing OBM) ফার্ম-এ উন্নীত হয়।

মূল যন্ত্রাংশ নির্মাতা (OEM) স্থানীয় ফার্মগুলো বহুজাতিক কোম্পানীর প্রদত্ত স্পেসিফিকেশন অনুসারে পণ্য উৎপাদন করে এবং বহুজাতিক কোম্পানী এসব পণ্য নিজ ব্রান্ড হিসেবে নিজস্ব বিক্রয় চ্যানেলের মাধ্যমে বাজারজাত করে। এ (OEM) স্তরে স্থানীয় ফার্ম বহুজাতিক কোম্পানীর কাছ থেকে মেশিন ও যন্ত্রপাতি ক্রয় ও স্থাপনে, ম্যানেজার, প্রকৌশলী ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণে এবং ব্যস্থাপনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরামর্শ ও সহায়তা পায়।

নিজস্ব ডিজাইনে নির্মান (ODM) পর্যায়ে স্থানীয় সরবরাহকারী ফার্মগুলো বহুজাতিক কোম্পানীর জন্য যে পণ্য উৎপাদন করে তার ডিজাইন তারা নিজেরাই তৈরী করার ক্ষমতা অর্জন করে। এ ক্ষেত্রেও উৎপাদিত পণ্য (যা বহুজাতিক কোম্পানীগুলো নিজেদের উৎপাদিত নিজস্ব পণ্যের যন্ত্রাংশ বা কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করে) ক্রেতারা নিজস্ব ব্রান্ড হিসেবে ব্যবহার করে বা বাজারজাত করে। এ (ODM) পর্যায়ে স্থানীয় ফার্মগুলো উৎপাদিত পণ্যের ডিজাইন তৈরী করার দক্ষতা অর্জন করে।

নিজস্ব ব্রান্ড নির্মাণ (OBM) হচ্ছে স্থানীয় সরবরাহকারী ফার্মগুলোর প্র যুক্তি শেখার সর্বশেষ ধাপ যেখানে তারা তাদের উৎপাদিত পণ্য নিজ ব্রান্ড হিসেবে নিজস্ব বিপণন চ্যানেলের মাধ্যমে বাজারজাত করে। এই স্তরে স্থানীয় শিল্পকারখানাগুলো তাদের প্রযুক্তিকে পুরোপুরি আয়ত্ব করতে সমর্থ হয়।

বহুজাতিক কোম্পানীগুলো স্থানীয় শিল্পকারখানাগুলোকে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সরবরাহকারী (sub-contractor) হিসেবে যুক্ত করে তাদের নিকট উল্লেখিত উপায়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রযুক্তি হস্তান্তর করে। এছাড়াও তারা বৈদেশিক বিনিয়োগ গ্রহীতা দেশে যে গবেষণা ও উন্নয়ন (Research and Development /R&D) কার্যক্রম পরিচালনা করে তাও এসব দেশে প্রযুক্তি স্থানান্তরের একটি গুরূত্বপূর্ণ চ্যানেল হিসেবে কাজ করে। এসব গবেষণা ও উন্নয়ন এর মাধ্যমে স্থানীয় লোকজনদের প্রযুক্তি গ্রহণ, উন্নয়ন, উদ্ভাবন ও ব্যবহারের ক্ষমতা দিন দিন বৃদ্ধি পায়।

৩। প্রযুক্তি স্থানান্তরে বহুজাতিক কোম্পানীগুলোর ভূমিকার মূল্যায়ন

উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায়, বহুজাতিক কোম্পানীগুলো তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোতে প্রযুক্তি স্থানান্তরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যদিও এসব দেশে বিনিয়োগের জন্য বহুজাতিক কোম্পানীগুলোর আগ্রহের মূল কারণ হলঃ (১) এসব দেশের মানব সম্পদ, কাঁচামাল ব্যবহার করে উৎপাদনে খরচ কমানো ও (২) স্থানীয় বাজার দখল করা, তবুও এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অবধারিতভাবে প্রযুক্তি বিনিয়োগ গ্রহীতা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। এটা ঘটে এসব কোম্পানীর ইচ্ছাতে অথবা অনিচ্ছাতে- উভয়ভাবেই। কাজেই বহুজাতিক কোম্পানীগুলো তৃতীয় বিশ্বের

দেশগুলোর জন্য প্রযুক্তি সংগ্রহের এবং শেখার জন্য সবচেয়ে গুরূত্বপূর্ণ উৎস- এটা অনস্বীকার্য।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, বিনিয়োগ গ্রহীতা দেশে সর্বাধিক শক্তিশালী যে তিনটি পন্থার মাধ্যমে প্রযুক্তি ছড়িয়ে পড়ে তা হল ঃ (ক) শ্রমিক ও ব্যবস্থাপকদের প্রশিক্ষণ (খ) স্থানীয় সরবরাহকারীদের কাছ থেকে যন্ত্রাংশ ক্রয় ও (গ) স্থানীয় গবেষণা ও উন্নয়ন।

বিভিন্ন সমীক্ষা থেকে দেখা গেছে বহুজাতিক কোম্পানীগুলো কর্মচারীদের দেশে ও বিদেশে অবস্থিত বিভিন্ন সাবসিডিয়ারী বা সদর দফতরে প্রশিক্ষণ প্রদান করার জন্য নিয়মিত প্রেরণ করে থাকে। এই লেখকের (Abdullah, 2001) থাইল্যান্ডের চারটি ইলেকট্রনিক্স এন্টারপ্রাইজের উপর (Toshiba, Matshushita, Sharp I JVC) পরিচালিত এক জরীপে দেখা যায় এসব কারখানার উৎপাদন তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত প্রকৌশলীদের প্রায় সকলেই বছরে একবার বা একাধিবার বিদেশে অবস্থিত সাবসিডিয়ারী বা সদর দফতরে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে থাকেন। এছাড়া মূল কোম্পানী থেকে প্রকৌশলীরা নতুন যন্ত্রপাতি স্থাপনকালে ও উৎপাদন কার্যক্রম শুরু হওয়ার সময় কয়েক সপ্তাহ থেকে কয়েক মাস এসব সাবসিডিয়ারীতে অবস্থান করে স্থানীয় প্রকৌশলী ও উৎপাদন শ্রমিকদের হাতে কলমে শিক্ষাদান করেছেন। ঢাকা রপ্তানী প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চলের উপর পরিচালিত এই লেখকের আরও একটি সমীক্ষায় (Rahman, 2002) অনুরূপ দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করা গেছে। এ থেকে এটা স্পষ্ট যে, বহুজাতিক কোম্পানীগুলো স্থানীয় প্রকৌশলী ও উৎপাদন শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে প্রযুক্তি স্থানান্তরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ঐ সমীক্ষায় (Abdullah, 2001) দেখা গেছে যে, যদিও শুরুতে এসব বহুজাতিক কোম্পানী প্রায় শতকরা একশত ভাগ যন্ত্রাংশই বাইরের দেশ থেকে সংগ্রহ করত, উৎপাদন শুরু কয়েক বছরের মধ্যেই স্থানীয় সরবরাহকারীদের উপর তাদের নির্ভরতা ক্রমাগতভাবে বাড়তে থাকে। এসব ফার্মের মোট যন্ত্রাংশের মূল্যের ৪০ থেকে ৬০ শতাংশ স্থানীয় সরবরাহকারীদের কাছ থেকে আসে (Abdullah, 2001) । এ থেকেই বোঝা যাচ্ছে, বহুজাতিক কোম্পানীগুলো স্থানীয় সরবরাহকারীদের প্রযুক্তি শিক্ষার জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

স্থানীয়ভাবে গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমেও বহুজাতিক কোম্পানীগুলো স্থানীয় প্রকৌশলী ও গবেষকদের উদ্ভাবনী ক্ষমতা বাড়াতে গুরূত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় ১৯৮২ সালের তুলনায় ১৯৯২ সালে যুক্তরাষ্ট্রের বহুজাতিক কোম্পানীগুলো বিদেশে অবস্থিত তাদের শিল্প ইউনিটগুলোতে গবেষণা ব্যয় সাড়ে তিনগুণ বৃদ্ধি করেছে। এসব বহুজাতিক কোম্পানীর গবেষণা খাতে মোট ব্যয়ে বিদেশে অবস্থিত ইউনিটগুলোর শেয়ার ১৯৮২ সালে ছিল শতকরা

৯ ভাগ যা ১৯৯২ সালে বেড়ে ১২ ভাগে উন্নীত হয় (UNCTAD, 1995)। এ থেকে বোঝা যাচেছ, বহুজাতিক কোম্পানীগুলো আগের তুলনায় স্থানীয় লোকদের প্রযুক্তিগত ও কারিগরি দক্ষতা গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। ফলে এটি প্রযুক্তি উৎপাদন ও স্থানান্তরকে অনেক সহজতর ও দ্রুত করবে।

তবে বহুজাতিক কোম্পানীগুলোর প্রযুক্তি স্থানান্তরে আন্তরিকতা নিয়ে শক্ত বিতর্ক আছে। বহু সমীক্ষায় দেখা গেছে, বহুজাতিক কোম্পানীগুলোর মধ্যে নতুন প্রযুক্তি উন্নয়নশীল দেশে স্থানান্তরে প্রচণ্ড অনীহা রয়েছে। তারা কেবলমাত্র পুরাতন প্রযুক্তি যার উন্নত সংস্করণ ইতোমধ্যে বের হয়েছে তা স্থানান্তর করে থাকে। এই আয় গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রমে বিনিয়োগ করে প্রযুক্তির আরও উন্নত সংস্করণ তৈরী করে থাকে এবং পুরাতনটি তৃতীয় বিশ্বের দেশে পাঠিয়ে দেয় (Chng et.al., 1986)।

তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশে তারা যে প্রযুক্তি স্থানান্তর করে তা এসব দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। ফলে এসব প্রযুক্তি স্থানান্তরের ফলে একদিকে বেকার সমস্যা আরও তীব্র আকার ধারণ করে, অন্যদিকে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত কাঁচামালের সুষ্ঠু ব্যবহারের সম্ভাবনাও নষ্ট হয়ে যায় (Lall, 1985; Chen, 1996; UN-ESCAP, 1988)।

প্রযুক্তিকে যদি গ্রহীতা দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, ভোক্তাদের চাহিদা, স্থানীয় কাঁচামাল ও উৎপাদনের উপকরণের সাথে খাপ খাওয়ানো সম্ভব না হয়, তবে তা গ্রহীতা দেশের জন্য খুব বেশী উপকারী নাও হতে পারে। Reddy and Zhao (1990) তাঁদের প্রবন্ধে বেশ কিছু গবেষণা নিবন্ধে প্রাপ্ত ফলাফল পর্যালোচনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, বহুজাতিক কোম্পানীগুলো স্থানীয় আর্থ-সামাজিক অবস্থার সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য প্রযুক্তির মধ্যে কোন পরিবর্তন আনতে আগ্রহী হয়নি। ফলে এসব প্রযুক্তি বিনিয়োগ গ্রহীতা দেশের জন্য কতটুকু উপকারী হবে তা প্রশ্ন সাপেক্ষ।

বহুজাতিক কোম্পানীগুলোর বিরুদ্ধে আরও একটি বড় অভিযোগ হল এরা উন্নয়নশীল ও অনুন্নত বিশ্বে অবস্থিত এদের সাবসিডিয়ারীসমূহে প্রযুক্তি স্থানান্তরের বিনিময়ে অত্যন্ত চড়া মূল্য আদায় করে এবং এই অর্থ কেন্দ্রে স্থানান্তর করে। এসব ক্ষমতাধর বহুজাতিক কোম্পানীর কাছ থেকে প্রযুক্তি আমদানীর জন্য গ্রহীতা দেশগুলো যে আর্থিক ব্যয়ের (ক্ষতির) সম্মুখীন হয় তাকে দু'ভাগে ভাগ করা যায় যথা- প্রত্যক্ষ ব্যয় ও পরোক্ষ ব্যয়। প্রত্যক্ষ ব্যয়ের মধ্যে সাবসিডিয়ারী প্রতিষ্ঠান বা প্রযুক্তি গ্রহীতা ফার্মকে যে উচ্চ হারে মুনাফা, রয়্যালটি, ও ফি পরিশোধ করতে হয় তা উল্লেখযোগ্য। অন্যদিকে পরোক্ষ ব্যয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্যগুলো হচ্ছেঃ প্রযুক্তি গ্রহীতা ফার্মকে প্রযুক্তি গ্রহণের শর্ত হিসেবে বাজারের একটি আয়তন নির্দিষ্ট করে

দেয়া যার বাইরে সে পণ্য বিক্রয় করতে পারবে না, প্রযুক্তি ক্রয়ের শর্ত হিসেবে উচ্চমূল্যে ক্রেতার কাছ থেকে কাঁচামাল বা যন্ত্রপাতি ক্রয় করতে বাধ্য করা, প্রযুক্তি বিক্রেতার প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছ থেকে কোন প্রকার প্রযুক্তি ক্রয় না করার ব্যাপারে ক্রেতাকে চুক্তিতে আবদ্ধ করা এবং গবেষণা ও উন্নয়ন (R&D), আমদানীকৃত প্রযুক্তির পরিবর্তন ও উদ্ভাবনীর উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ (Chen, 1996)। এরূপ নিষেধাজ্ঞা অর্থনীতির উপর ব্যাপকভাবে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। অর্থনীতির রপ্তানী করার ক্ষমতা ও সুযোগ কমে যায়, আমদানী ব্যয় বেড়ে যায়, প্রযুক্তি সংগ্রহ ও উদ্ভাবনীর ক্ষমতা কমে যায়। বাণিজ্য ভারসাম্য প্রতিকূলে যায় এবং সার্বিকভাবে উন্নয়নের গতি মন্থর হয়ে যায়।

বহুজাতিক কোম্পানীগুলোর বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ হল তারা পরিবেশের জন্য মারাত্মকভাবে ক্ষতিকর প্রযুক্তি এসব দেশে স্থানান্তরিত করে।

বৈদেশিক বিনিয়োগ গ্রহণ করার পক্ষে একটি বড় যুক্তি হচ্ছে বহুজাতিক কোম্পানীগুলো প্রযুক্তি গ্রহীতা দেশের জনবলের বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধি করে এসব দেশে স্থানীয়ভাবে প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও বিদেশী প্রযুক্তি দ্রুত গ্রহণ ও আত্মস্থ করার ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। কিন্তু বহুজাতিক কোম্পানীগুলো প্রযুক্তি গ্রহীতা দেশে যে ধরনের গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করে তা মুলতঃ প্রযুক্তি হাল্কা ধরনের পরিবর্তনের মধ্যে সীমিত থাকে (স্থানীয় আর্থ-সামাজিক অবস্থার সাথে খাপ খাওয়ানেরা জন্য)। তারা কেবলমাত্র প্রযুক্তির পরিচালনা কৌশল (Know how) স্থানান্তর করে। কিন্তু প্রযুক্তির নির্মাণ কৌশল (know why) স্থানান্তরে আগ্রহী হয় না (Lall, 1987)। ফলে এধরনের গবেষণা ও উন্নয়ন স্থানীয় লোকজনের বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি দক্ষতা গড়তে তেমন কোন ভূমিকা রাখেনা। বরং কোন একটি দেশে যদি বহুজাতিক কোম্পানীগুলোর একচেটিয়া আধিপত্য থাকে তবে সে দেশের জনবলের বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি দক্ষতা অত্যন্ত নিম্নস্তরে সীমিত থাকতে পারে (Lall, 1985)। কারণ বহজাতিক কোম্পানীর একচেটিয়া আধিপত্যের কারণে স্থানীয় ফার্মগুলোর পক্ষে বাজার দখল বা বাজার শেয়ার সম্প্রসারণ করে গবেষণা ও উন্নয়ন পরিচালনার মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি দক্ষতা গড়ে তুলতে ভূমিকা পালন করা সম্ভব হয় না। বহুজাতিক কোম্পানীগুলো প্রকৃত পক্ষে তাদের সদর দফতরেই কেন্দ্রীয়ভাবে গবেষণা পরিচালনা করে থাকে। কারণ এতে আয়তনগত সুবিধা (Economies of scale) উসুল করা সম্ভব হয়। এছাড়া প্রযুক্তি গ্রহীতা দেশে দক্ষ গবেষণা ও উন্নয়ন কর্মী ও প্রয়োজনীয় অবকাঠামো না থাকায় এবং এসব দেশে মেধা স্বত্ব সংরক্ষণের ব্যবস্থা শক্তিশালী না হওয়ায় তারা এসব দেশে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করতে আগ্রহী হয় না।

৪। দেশে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগের মাধ্যমে প্রযুক্তি সংগ্রহের গুরুত্ব

যে কোন দেশে প্রযুক্তি সংগ্রহের দু'টি উৎস থাকে। একটি হচ্ছে নিজেরা উদ্ভাবন করা। অন্যটি হচ্ছে বাইরে থেকে আমদানী করা। আমাদের মতো দরিদ্র দেশের পক্ষে উল্লেখিত দু'টো উৎস থেকেই প্রযুক্তি ব্যবহার করার সুযোগ অত্যন্ত সীমিত। প্রয়োজনীয় মানব ও আর্থিক সম্পদ এবং অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধার কারণে আমরা নিজেরা নিজেদের প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি উদ্ভাবন করতে পারি না। আবার অন্যদিকে বাজার ও ক্রয় ক্ষমতার সীমাবদ্ধতার কারণে আমরা কম চাহিদা-কম বিনিয়োগ-নিম্ন উৎপাদনশীলতা-কম আয়-কম চাহিদা চক্রের মধ্যে আবদ্ধ। ফলে আমাদের পক্ষে বাইরে থেকে বিপুল ব্যয়ে আধুনিক প্রযুক্তি সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। এমতাবস্থায় প্রযুক্তির উৎস হিসাবে দেশে বহুজাতিক কোম্পানীগুলোর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে যদি পর্যাপ্ত পরিমাণ বৈদেশিক বিনিয়োগ পাওয়া যায়।

দেশে উদ্ভাবনী উন্নয়নের মাধ্যমে প্রযুক্তির চাহিদা পূরণের সম্ভাবণা ক্ষীণ। প্রযুক্তি উদ্ভাবনে দেশে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জিত না হবার পিছনে প্রধান প্রধান কারণগুলো হলঃ

(ক) শিল্পখাতে গবেষণা ও উন্নয়ন উদ্যোগের অনুপস্থিতি। বাংলাদেশের অধিকাংশ শিল্প প্রতিষ্ঠানই ক্ষুদ্র ও মাঝারী আকৃতির। এসব শিল্প প্রতিষ্ঠান মূলতঃ স্থানীয় বাজারে বিপণনের জন্য দ্রব্য উৎপাদন করে। এসব প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশের মূলধন সংগৃহীত হয়েছে পারিবারিক উৎস থেকে। ফলে এসব প্রতিষ্ঠানের মূলধন সীমিত। সীমিত মূলধনের কারণে এসব প্রতিষ্ঠানের গবেষণা ও উন্নয়ন কাজে অর্থ বিনিয়োগ করার ব্যাপারে চরম অনীহা রয়েছে। বিশেষতঃ এরূপ বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় এবং এরূপ বিনিয়োগের জন্য উপযুক্ত মানব সম্পদের ব্যাপক অপ্রতুলতা থাকায় এসব প্রতিষ্ঠান গবেষণা ও উন্নয়নের সামান্যতম উদ্যোগও গ্রহণ করে না। এসব প্রতিষ্ঠানের কোন গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগ নেই, নেই কোন গবেষণা ও উন্নয়ন বাজেট বা প্রকল্প। বিশেষতঃ বাজারের আকার সীমিত হবার কারণে গবেষণা খাতে বিনিয়োগকৃত অর্থ উসুল করতে অনেক দীর্ঘ সময় প্রয়োজন হবে বিধায় গবেষণা ও উন্নয়নের কোন উদ্যোগই এরা গ্রহণ করে না।

(খ) গবেষণা প্রতিষ্ঠান, শিল্প কারখানা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ত্রিমুখী সংযোগের অনুপস্থিতি। প্রযুক্তি উদ্ভাবন প্রক্রিয়ার সাফল্য নির্ভর করে গবেষণা প্রতিষ্ঠান, শিল্প-কারখানা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঝে ত্রিমুখী সংযোগের শক্তির উপর। এই সংযোগ যত শক্তিশালী হবে প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও বাণিজ্যিকীকরণ তত ত্বরান্বিত হবে। শিল্প ইউনিটগুলো তাদের প্রয়োজনীয় প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও উন্নয়নের জন্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সহায়তা নেবে এবং এজন্য প্রয়োজনীয় অর্থ যোগান দেবে এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথ উদ্যোগে এসব প্রযুক্তি উদ্ভাবন করবে

এবং তাদের উদ্ভাবিত প্রযুক্তি বাণিজ্যিকভিত্তিতে ব্যবহারের জন্য শিল্প-কারখানাগুলোর নিকট হস্তান্তর করবে - এ রকম ত্রিমুখী সংযোগ অত্যন্ত জরুরী। কিন্তু এ রকম সংযোগ দেশে নেই বললেই চলে।

(গ) বেসরকারি খাতে অমুনাফাভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান গড়ে না উঠা ।

(ঘ) সরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠানে অভিজ্ঞ গবেষক ও গবেষণা ফান্ডের অপ্রতুলতা। দেশে শিল্প গবেষণার জন্য সরকারিখাতে গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা নিতান্তই অপ্রতুল। শিল্পখাতের সাথে সংযোগ না থাকায় বাজারে কি ধরনের প্রযুক্তির চাহিদা রয়েছে এসব প্রতিষ্ঠান তা নিরূপণ করতে পারে না। ফলে এরা বাজার চাহিদাভিত্তিক প্রযুক্তি উদ্ভাবনের পরিবর্তে নিজেদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক গবেষণা প্রকল্প গ্রহণ করে এবং প্রযুক্তির উদ্ভাবন করে যার বাজার চাহিদা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কম থাকে। ফলে এসব প্রযুক্তি বাণিজ্যিকীকরণের সুযোগ অনেক ক্ষেত্রেই হয় না।

বেসরকারি খাতের শিল্প-কারখানাগুলোর সাথে গবেষণা ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের সংযোগ না থাকায় এসব প্রতিষ্ঠান কেবল সরকারি অর্থানুকূল্যে গবেষণা প্রকল্প গ্রহণ করে। কিন্তু ফান্ডের স্বল্পতার কারণে এসব প্রতিষ্ঠানে প্রযুক্তি উদ্ভাবন কার্যক্রম অত্যন্ত সীমিত আকারে পরিচালিত হয়। অন্যদিকে এসব গবেষণা প্রতিষ্ঠানে ব্যয়িত অর্থের প্রায় ৮০% অফিস ব্যবস্থাপনার জন্য ব্যয় হয়ে থাকে। ফলে এসব গবেষণা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে শিল্প গবেষণার জন্য অত্যন্ত সীমিত অবদান রাখা সম্ভব হয়। কাজেই দেশে কার্যকর কোন শিল্প গবেষণা প্রক্রিয়া গড়ে উঠেনি।

(ঙ) শিল্পসমূহের মধ্যে দুর্বল আন্তঃসংযোগ ও যৌথ উদ্যোগে গবেষণার অনুপস্থিতি। দেশের অধিকাংশ শিল্প কারখানাগুলো ক্ষুদ্র ও মাঝারী আকৃতির হওয়ায় যেহেতু তারা একক উদ্যোগে গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম করতে পারে না, যৌথ উদ্যোগে এদের পক্ষে প্রযুক্তি উদ্ভাবনে গুরূত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা সম্ভব। এতে ল্যাবরেটরী ও মানব সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব। কিন্তু দেশে এরূপ যৌথ উদ্যোগে গবেষণা পরিচালনার কোন উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায় না।

(চ) বিজ্ঞান, প্রযুক্তি শিক্ষার জন্য পর্যাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান না থাকায় এসব বিষয়ে দক্ষ জনশক্তির অভাব। দেশে বিজ্ঞান শিক্ষাকে এখনও জনপ্রিয় করা সম্ভব হয়নি। বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষা লাভের জন্য দেশে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই বললেই চলে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে মান্দাতা আমলের সিলেবাস পড়ানো হচ্ছে। উন্নত বিশ্বে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাম্প্রতিককালে যে সব উন্নয়ন ঘটেছে সে সম্পর্কে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা পরিচিত হবার কোন সুযোগ পায়না। ল্যাবরেটরীতে ফান্ডের অভাবে আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের কোন সুযোগ নেই। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সরকারি অনুদানে চলায় এবং বেসরকারি খাতের (ছাত্রদের) এতে কোন অবদান না থাকায় (বেতন, ফি, ইত্যাদির মাধ্যমে) এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞান শিক্ষার মান

উন্নয়ন করা সম্ভব হচ্ছে না। এ ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কেবলমাত্র বিজ্ঞানের অত্যন্ত সীমিত কয়েকটি বিষয়ের উপর উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। বিজ্ঞান বিষয়ে দক্ষ জনশক্তির অভাব দেশে প্রযুক্তি উদ্ভাবনের একটি বড় অন্তরায়।

(ছ) মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণখাতে অর্থ ব্যয়ে শিল্পসমূহের অনীহা। দেশে শিল্পখাতের একটি বড় অংশ বেসরকারি খাতে অবস্থিত। কিন্তু বেসরকারিখাতে মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য অর্থ ব্যয়ের সংস্কৃতি দেশে এখনো গড়ে উঠেনি। দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারী আকৃতির শিল্প-কারখানাগুলো মানব সম্পদ উন্নয়নে অর্থ ব্যয় না করার কারণে ট্রেনিং এর চাহিদা না থাকায় দেশে বেসরকারি খাতে ট্রেনিং ইন্সটিটিউট ও গড়ে উঠেনি।

(জ) বিজ্ঞানী ও গবেষকদের উচ্চ শিক্ষার জন্য বিষয়ভিত্তিক (specialized) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব। দেশে বিজ্ঞানের বিশেষ বিশেষ শাখার উপরে বিজ্ঞানী ও গবেষণা কর্মীদের উচ্চ শিক্ষার জন্য বিষয়ভিত্তিক উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই বললেই চলে। দক্ষ শ্রমিক গড়ে তোলার জন্য ভকেশনাল ও টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউটও অপ্রতুল। এ ছাড়াও বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে সাম্প্রতিককালে যে সব উন্নয়ন ঘটেছে সে সম্পর্কে বিজ্ঞানী ও গবেষণাকর্মীদের অবহিত রাখার জন্য কোন ধারাবাহিক (continuing) ট্রেনিং ইন্সটিটিউট নেই। দেশে ডিজাইন বিষয়ে দক্ষতা সৃষ্টির জন্য ডিজাইন ইন্সটিটিউটও গড়ে উঠেনি। বিজ্ঞানী ও গবেষকদের জন্য উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব প্রযুক্তির উদ্ভাবনী ক্ষমতা অর্জনে একটি বড় অন্তরায় হিসেবে কাজ করছে।

(ঝ) প্রযুক্তি সম্পর্কে তথ্য ব্যবস্থা গড়ে না উঠায় দেশে প্রযুক্তি সম্পর্কে তথ্য প্রবাহের অভাব প্রকট। বিদেশী প্রযুক্তি সম্পর্কে তথ্য প্রদান থেকে শুরু করে তা বাছাই, দাম নির্ধারণ ও আমদানিকৃত প্রযুক্তি স্থাপন পর্যন্ত সকল ধাপে সহায়তা করার জন্য সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে পরামর্শক ফার্মের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। এ জাতীয় ফার্মের প্রযুক্তিগত সহায়তা ছাড়া একটি দেশে প্রযুক্তির স্থানান্তর ও তা ব্যবহারের মাধ্যমে উন্নয়ন ও নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা সম্ভব হয় না।

এ জাতীয় পরামর্শক ফার্ম (consulting firm) এর পাশাপাশি সরকারি উদ্যোগে সর্বাধুনিক প্রযুক্তির প্রাপ্যতা সম্পর্কে ডাটা বেজ গড়ে তোলা ও তার প্রবাহ নিশ্চিত করার জন্য তথ্য কেন্দ্র গড়ে তোলা দরকার। এই সব তথ্য কেন্দ্র থেকে বিষয়ভিত্তিক সর্বাধুনিক প্রযুক্তি সম্পর্কে শিল্পোদ্যোক্তারা খোঁজ খবর জানতে পারবে, যা প্রযুক্তি সংগ্রহকে ত্বরান্বিত ও সহজ করবে।

তথ্য কেন্দ্রের পাশাপাশি বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের উপর সর্বশেষ উন্নয়ন সম্পর্কে গবেষণাকর্মীদের জ্ঞানকে হালনাগাদ রাখার জন্য বিজ্ঞান বিষয়ক লাইব্রেরী স্থাপন প্রয়োজন এবং এসব লাইব্রেরী যাতে সরকারি বেসরকারিখাতের গবেষণাকর্মীরা সহজে ব্যবহার করতে পারে তার সুযোগ থাকা দরকার। কিন্তু দেশে এসব সুযোগ খুবই সীমিত যা প্রযুক্তির উদ্ভাবনকে বাধাগ্রস্ত করছে।

(ঞ) ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগের জন্য ঝুঁকি মূলধন (venture capital) এর অভাব। দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংক ও অন্যান্য অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানগুলো প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও বাণিজ্যিকীকরণের জন্য কোন ঋণ সহায়তা প্রদান করে না। কিন্তু প্রযুক্তির উদ্ভাবনের জন্য বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ বলে দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারী আকারের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো এসব ঝুঁকিপূর্ণ প্রকল্পে অর্থ বিনিয়োগে উৎসাহবোধ করে না। এবং

(ট) প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সংগ্রহে সরকারের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা ও যথাযথ পৃষ্ঠপোষকতার অভাব। দেশে প্রযুক্তিগত ক্ষমতার যথাযথ বিকাশ না ঘটার পিছনে একটি বড় কারণ হল, মধ্য বা দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনার পরিপূরক হিসেবে প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানোর জন্য কোন পরিকল্পনা প্রণয়ন না করা। উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে কখনই প্রযুক্তির সংগ্রহ, উন্নয়ন, উদ্ভাবন ও ব্যবহারের ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য যথাযথভাবে গুরূত্ব দেয়া হয়নি এবং এ লক্ষ্যে কোন কর্মসূচিও প্রণয়ন করা হয়নি। প্রযুক্তিগত ক্ষমতা অর্জনের উপর যথাযথ গুরূত্ব না দিয়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করায় তা কাঙ্খিত উন্নয়ন অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে।

কাজেই উপরে উল্লেখিত কারণগুলোর জন্য দেশে উদ্ভাবনের মাধ্যমে প্রযুক্তির চাহিদা পূরণে আশাব্যাঞ্জক অগ্রগতি লাভ করা অদূর ভবিষ্যতে সম্ভব নয়। আবার সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণে দেশীয় উদ্যোক্তাদের মাধ্যমে অত্যন্ত ব্যয়বহুল প্রযুক্তি সংগ্রহ করার সম্ভবণাও খুব ক্ষীণ। এ কারণে দেশে প্রযুক্তি সংগ্রহের জন্য বিদেশী বিনিয়োগের গুরূত্ব অনস্বীকার্য। বিশেষতঃ বিদেশী বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত প্রযুক্তি থেকে দেশের অর্থনীতির জন্য নিম্নে উল্লেখিত কল্যাণগুলো সাধিত হবেঃ

(ক) দেশে অবস্থিত বহুজাতিক কোম্পানীতে নিয়োজিত শ্রম শক্তি কোম্পানীর কাছ থেকে প্রযুক্তি শেখার সুযোগ লাভ করবে, যা ধাপে ধাপে আমাদের প্রযুক্তি ব্যবহার, পরিবর্তন ও উন্নয়ন করার ক্ষমতা তৈরী করবে এবং ভবিষ্যতে সম্পূর্ণ নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের ক্ষমতা সৃষ্টি করবে।

(খ) বৈদেশিক বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত আধুনিক প্রযুক্তি আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতা করার ক্ষমতা বাড়াবে এবং এ থেকে তুলনামূলক সুবিধা (comparative advantage) পাওয়া যাবে যা আমাদের রপ্তানী আয় বাড়াবে। উপযুক্ত প্রযুক্তির অভাবে যে সব বাজারে প্রবেশ করা যায়নি, বৈদেশিক বিনিয়োগ

থেকে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি পেলে আমরা সে সব বাজারে প্রবেশ করতে সক্ষম হব যা আমাদের রপ্তানী আয় বাড়াবে।

(গ) বৈদেশিক বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত প্রযুক্তির মাধ্যমে আমরা উন্নত প্রযুক্তির সুফল ভোগে সক্ষম হব কিন্তু এ জন্য আমাদের আভ্যন্তরীণ উৎস থেকে বৈদেশিক মুদ্রায় কোন ব্যয় করতে হবে না। ফলে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের উপর কোন চাপ পড়বে না।

(ঘ) বৈদেশিক বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত প্রযুক্তি দেশে কমসংস্থানের সুযোগ তৈরী করবে।

(ঙ) বৈদেশিক বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত প্রযুক্তি আমাদের নিম্ন ধাপ থেকে সরাসরি উচ্চ ধাপে পৌছার (leapfrogging) সুযোগ তৈরী করবে। বর্তমানে আন্তর্জাতিক বাজারে যে সব প্রযুক্তি আছে বৈদেশিক বিনিয়োগ গ্রহণ করে সে সব প্রযুক্তিকে ব্যবহারের সুযোগ গ্রহণে সক্ষম হব এবং পরবর্তীতে আমরা প্রযুক্তি আত্নস্থ করার পর আমাদের সীমিত সম্পদ আরও উন্নত ও আধুনিক প্রযুক্তি নির্মাণে ব্যয় করতে পারব । এক্ষেত্রে একই ধরনের প্রযুক্তি তৈরীর জন্য দেশের সীমিত সম্পদের যে অপচয় হবে তা রোধ করা সম্ভব হবে।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে দেখা যায়, দেশে প্রযুক্তির চাহিদা পূরণে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তার কথা অস্বীকার করা যায় না। বিশেষতঃ প্রযুক্তি উদ্ভাবনে আমাদের আর্থিক ও মানব সম্পদের তীব্র অপ্রতুলতা এবং দেশের গবেষণা ও উন্নয়ন কাঠামোর দুর্বলতার কথা বিবেচনা করলে প্রযুক্তি শিক্ষা ও প্রযুক্তির চাহিদা পূরণে বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য দেশে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা উচিত এবং এ থেকে কিভাবে প্রযুক্তির সরবরাহ বাড়ানো যায়, সে চেষ্টা করা উচিত। নিবন্ধের পরবর্তী অংশে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

৫। দেশে বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের মাধ্যমে কিভাবে প্রযুক্তির স্থানান্তর বাড়ানো যায়?

দেশে বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের মাধ্যমে প্রযুক্তি স্থানান্তরে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জিত না হওয়ার পেছনে একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলে বৈদেশিক বিনিয়োগের মাধ্যমে প্রযুক্তি স্থানান্তর উৎসাহিত করার জন্য সরকারের সহায়ক নীতিমালার অভাব। বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের সংক্রান্ত সরকারী নীতিমালার ভিত্তি হচ্ছে কর্মসংস্থান ও রপ্তানী আয় বৃদ্ধির ন্যায় স্বল্পকালীন সুফল ভোগ। এই নীতিমালা প্রণয়নে প্রযুক্তি উন্নয়ন ও উদ্ভাবনের ক্ষমতা অর্জনের ন্যায় দীর্ঘকালীন সুফল লাভের

বিষয়কে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে কম। একারণে বৈদেশিক বিনিয়োগকে প্রায় সকল খাতে উন্মুক্ত ও শর্তহীন করা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ থেকে একটি দেশের যদি প্রযুক্তি শিক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হয়, তবে বৈদেশিক বিনিয়োগকে কিছু মাত্রায় নিয়ন্ত্রণের কোন বিকল্প নেই। বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগকে কিছু মাত্রায় নিয়ন্ত্রণ করলে বা বিনিয়োগের উপর প্রযুক্তি শেখার জন্য কিছু শর্ত আরোপ করলেই কেবলমাত্র দেশে প্রযুক্তি স্থানান্তরের সুযোগ তৈরী হবে। অন্যথায় এরূপ সম্ভাবনা কম। বরং বিদেশী বিনিয়োগকারীরা দেশের সস্তা শ্রম ও কাঁচামাল ব্যবহার করে অর্জিত মুনাফা কেন্দ্রে পাচার করবে, এবং বিনিময়ে দেশের দীর্ঘমেয়াদী কোন কল্যাণ সাধিত হবে না।

বৈদেশিক বিনিয়োগের এর মাধ্যমে প্রযুক্তি স্থানান্তরে যথেষ্ট সাফল্য অর্জিত না হবার আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে দেশে পর্যাপ্ত বৈদেশিক বিনিয়োগ না আসা। বিনিয়োগের জন্য পর্যাপ্ত অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধার অভাব, সরকারী রেগুলেটরী ও সার্ভিস এজেন্সীসমূহের আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রিতা ও দূর্নীতি, সামষ্টিক অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা, রাজনৈতিক অস্থিরতা, পুঁজি বাজার ও ব্যাংকিং ব্যবস্থার দুর্বলতা, দক্ষ জনশক্তির অপ্রতুলতা, তথ্য প্রযুক্তির পশ্চাদপদতা এবং বিনিয়োগের সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে মিডিয়া ও বিজনেস ফোরামে পর্যাপ্ত প্রচারের ব্যবস্থা না থাকা ইত্যাদি দেশে পর্যাপ্ত বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ প্রাপ্তির ব্যর্থতার কয়েকটি প্রধান কারণ।

এজন্য দেশে বৈদেশিক বিনিয়োগ থেকে প্রযুক্তির স্থানান্তর জোরদার ও ত্বরান্বিত করার জন্য দু'টো দিকে মনোযোগ দিতে হবে। প্রথমতঃ বৈদেশিক বিনিয়োগ থেকে যেন প্রযুক্তির বিভিন্ন উপাদান বেশী পরিমাণে দেশে স্থানান্তরিত হয় সে জন্য 'নিয়ন্ত্রণ' ও আর্থিক উৎসাহ ভিত্তিক নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ দেশে বৈদেশিক বিনিয়োগের প্রবাহ বাড়াতে অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা বাড়াতে হবে এবং উপরে উল্লেখিত প্রতিবন্ধকতা/দুর্বলতাগুলোকে অপসারণ করতে হবে।

বৈদেশিক বিনিয়োগ থেকে কিভাবে বেশী মাত্রায় প্রযুক্তির স্থান ান্তর নিশ্চিত করা যায়, সে সম্পর্কে প্রথমে আলোচনা করা যাক। নিম্নোক্ত কৌশলগুলো অবলম্বন করে বৈদেশিক বিনিয়োগ থেকে প্রযুক্তির স্থানান্তর বৃদ্ধি করা যেতে পারে ঃ

(ক) যৌথ উদ্যোগে শিল্প স্থাপন উৎসাহিত করে

দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগকারীদের যৌথ উদ্যোগে স্থাপিত শিল্পকারখানার মাধ্যমে প্রযুক্তি স্থানান্তরের সম্ভাবনা অনেক বেশী। যেহেতু এ ক্ষেত্রে স্থানীয় উদ্যোক্তারা বিনিয়োগ করে, তারা প্রযুক্তি স্থানান্তর ও পরিচালনার ক্ষেত্রে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করে ফলে বিদেশী বিনিয়োগকারীদের পক্ষে কাঠোরভাবে গোপনীয়তা রক্ষা করা

সম্ভব হয় না। কারণ ড্রয়িং, ডিজাইন, স্পেসিফিকেশনসহ প্রযুক্তির বিভিন্ন বিষয়ের গোপনীয় তথ্য ও উপাত্ত স্থানীয় উদ্যোক্তাদের অবহিত করতে বিদেশী বিনিয়োগকারীরা বাধ্য হয়। প্রযুক্তি স্থাপন, পরিচালনা, মেরামত ও সংরক্ষণ (repair, maintenance) প্রভৃতি বিভিন্ন ধাপে দেশীয় প্রকৌশলী ও টেকনিশিয়ানরা বিদেশীদের সাথে কাজ করায় তারা এসব বিষয়ে জ্ঞান লাভ করার সুযোগ লাভ করে। বিনিয়োগে স্থানীয় উদ্যোক্তাদের অংশীদারিত্বের কারণে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় তারা ভূমিকা রাখার সুযোগ পায় বিধায় তাদের পক্ষে এসব বিষয়ে জ্ঞান লাভের সুযোগ পাওয়া সম্ভব হয়। কিন্তু বহুজাতিক কোম্পানীগুলো যখন কেবলমাত্র একক উদ্যোগে সাবসিডিয়ারী প্রতিষ্ঠা করে তখন প্রযুক্তির ব্যবহার কৌশল সম্পর্কে তারা স্থানীয় কর্মীদের প্রশিক্ষিত করলেও মেরামত ও সংরক্ষণ এর ব্যাপারে তারা অনেক ক্ষেত্রেই এদের অজ্ঞ রাখে। এছাড়াও প্রযুক্তির নির্মাণ কাঠামো সম্পর্কে স্থানীয় কর্মীদের নিকট কাঠোরভাবে গোপনীয়তা বজায় রাখা হয়।

যেহেতু আধুনিক প্রযুক্তি মৌল জ্ঞান (tacit knowledge) নির্ভর যা কেবলমাত্র বিদেশীদের সঙ্গে কাজ করে বা তাদের সাথে মত বিনিময় করেই অর্জন করা সম্ভব, কাজেই আমাদের যৌথ উদ্যোগে শিল্প স্থাপনেই বেশী মনোযোগ দিতে হবে। কারণ এর মাধ্যমেই কেবল এ ধরনের সুযোগ লাভ করা সম্ভব হবে। এছাড়া এ জাতীয় প্রতিষ্ঠানে আধুনিক ব্যবস্থাপনার কৌশল সম্পর্কে স্থানীয় কর্মচারীরা জ্ঞান লাভের সুযোগ পায় যা উৎপাদনশীলতা বাড়াতে ভূমিকা রাখে।

দেশে বিদেশীদের সাথে যৌথ উদ্যোগে শিল্প স্থাপন উৎসাহিত করার জন্য এ জাতীয় শিল্পকে একক উদ্যোগে স্থাপিত শিল্পের তুলনায় অধিক হারে আর্থিক সুযোগ সুবিধা দেয়া যেতে পারে (যেমনঃ দীর্ঘকালীন ট্যাক্স হলিডে, আয়কর মওকুফ বা রপ্তানী আয় কর মুক্ত রাখা ইত্যাদি)।

(খ) উৎপাদনে স্থানীয় উপাদান (Local content) বৃদ্ধিকে উৎসাহিত করে

বহুজাতিক কোম্পানীগুলো তাদের স্থানীয় সাবসিডিয়ারীতে যদি উৎপাদিত পণ্যের সকল যন্ত্রাংশ তৈরী করে তবে অধিক হারে প্রযুক্তি স্থানান্তরের সুযোগ সৃষ্টি হবে। অন্যদিকে যদি অল্প কয়েকটি যন্ত্রাংশ তৈরী করে এবং অধিকাংশই বাইরে থেকে এনে সংযুক্ত করে তবে প্রযুক্তি স্থানান্তরের সুযোগ কমে যাবে। বস্তুতঃ যদি সকল যন্ত্রাংশ বাইরে থেকে আসে তবে দেশে প্রযুক্তির কোন স্থানান্তরই ঘটবে না। কাজেই উৎপাদনে স্থানীয় উপাদান যেন বাড়ে সে জন্য বিনিয়োগ মঞ্জুরীর পূর্বে শর্তারোপ করা যেতে পারে যে বহুজাতিক কোম্পানীগুলোকে তাদের উৎপাদিত দ্রব্যের একটি নির্দিষ্ট হারে স্থানীয় উপাদান প্রতি বছর বাড়াতে হবে। স্থানীয় উপাদান বাড়ার সাথে

সাথে অধিক হারে আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করেও স্থানীয় উপাদান বাড়ানোর ব্যাপারে উৎসাহিত করা যায় এবং অধিক হারে প্রযুক্তির স্থানান্তর নিশ্চিত করা যায়।

(গ) পশ্চাৎ সংযোগ শিল্পের সাথে সম্পৃক্ততা উৎসাহিত করে

দেশীয় পশ্চাদ সংযোগ শিল্পসমূহের কাছ থেকে বহুজাতিক কোম্পানীগুলোর প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ ক্রয় উৎসাহিত করতে হবে। কারণ এর মাধ্যমে এসব পশ্চাৎ সংযোগ শিল্পগুলো প্রযুক্তি সংগ্রহ ও প্রযুক্তিগত ক্ষমতার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা লাভ করে। এধরনের সম্পৃক্ততাকে উৎসাহিত করার জন্য বহুজাহিক কোম্পানীগুলোর বাইরে থেকে যন্ত্রাংশ আমদানী করার উপর উচ্চহারে কর আরোপ করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। এছাড়া দেশে পশ্চাৎ সংযোগ শিল্পের বিকাশ ও আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য এদের সাময়িকভাবে আর্থিক সহযোগিতা প্রদানের ব্যবস্থা করা উচিত।

(ঘ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলে

দেশে বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা ও এই বিনিয়োগ থেকে দ্রুত প্রযুক্তি শিক্ষার জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা আবশ্যক। কারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে সুশিক্ষিত শ্রমিক, টেকনিশিয়ান ও বিজ্ঞানী গড়ে উঠলে এদের পক্ষে বহুজাতিক কোম্পানীগুলোতে কাজ পাওয়া সহজ হবে এবং এরা সুশিক্ষিত হওয়ায় দ্রুত প্রযুক্তি আয়ত্ব করতে সমর্থ হবে। এরা যখন বহুজাতিক কোম্পানী ছেড়ে স্থানীয় ফার্মে যোগদান করবে তখন এদের মাধ্যমে প্রযুক্তি দেশীয় ফার্মগুলোর নিকট স্থানান্তরিত হবে। এজন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার ব্যাপারে সরকারের বিশেষ মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন। দেশে বিজ্ঞান বিষয়ে উচ্চ শিক্ষার জন্য আরও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। এছাড়া বিজ্ঞানের বিশেষ বিশেষ শাখার উপরে বিজ্ঞানী ও গবেষণা কর্মীদের উচ্চ শিক্ষার জন্য বিষয়ভিত্তিক উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা প্রয়োজন। দক্ষ শ্রমিক গড়ে তোলার জন্য আরও ভকেশনাল ও টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট গড়ে তোলা প্রয়োজন। এ ছাড়াও বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে সাম্প্রতিককালে যে সব উন্নয়ন ঘটেছে সে সম্পর্কে বিজ্ঞানী ও গবেষণাকর্মীদের অবহিত রাখার জন্য ট্রেনিং ইন্সটিটিউট গড়ে তোলা প্রয়োজন।

দেশের বেসরকারি শিক্ষা ব্যবস্থা, বিশেষতঃ বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে, বিজ্ঞান শিক্ষায় তেমন কোন ভূমিকা রাখতে পারছে না। দেশের প্রায় সকল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাজার চাহিদা ভিত্তিক দু'একটি বিষয়ে কেবলমাত্র স্নাতক পর্যায়ের

কোর্স পড়ানো হচ্ছে। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চ শিক্ষার জন্য কোর্স চালু করার ব্যাপারে আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে উৎসাহিত করা উচিত। দেশের নতুন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় খোলার অনুমতি দানের ক্ষেত্রে মোট টিউশন ফি'র একটি নির্দিষ্ট অংশ বিজ্ঞান শিক্ষা থেকে আয়ের জন্য বা মোট কোর্সের একটি নির্দিষ্ট অংশ বিজ্ঞান বিষয়ক হতে হবে এরকম শর্ত আরোপ করা প্রয়োজন। যে সব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে তাদের শিক্ষা কার্যক্রমকে অনুরূপভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে।

(ঙ) গবেষণা ও উন্নয়ন উৎসাহিত করে

বহুজাতিক কোম্পানীগুলো যাতে তাদের স্থানীয় সাবসিডিয়ারীতে গবেষণা ও উন্নয়ন ইউনিট খোলে ও তাতে অর্থপূর্ণ গবেষণা করে তা উৎসাহিত করতে হবে। এজন্য গবেষণা খাতে যে পরিমাণ অর্থ তারা ব্যয় করে আয় থেকে তার কয়েকগুণ অর্থকে কর অব্যাহতি দেয়া প্রয়োজন। এক্ষেত্রে পার্শ্ববর্তী দেশগুলো যে হারে গবেষণা খাতে ব্যয়িত অর্থের জন্য কর অব্যাহতি দেয়, তার চেয়ে বেশী হারে কর অব্যাহতি দেয়া প্রয়োজন। যদি গবেষণা ও উন্নয়ন ইউনিটে বিদেশী গবেষকদের সাথে দেশী গবেষকেরা যৌথ গবেষণা কর্মে অংশ নেয় তবে গৃহীত গবেষণা প্রকল্পে সরকার অর্থ মঞ্জুরীর বিষয় বিবেচনা করতে পারে। এছাড়া স্থানীয় শিল্পের সাথে বহুজাতিক কোম্পানীগুলোকে যৌথভাবে গবেষণায় উৎসাহিত করার জন্য যৌথ উদ্যোগে গৃহীত গবেষণা প্রকল্পে সরকার অর্থ মঞ্জুর করতে পারে। এভাবে দেশী বিদেশী শিল্পের মধ্যে গবেষণার ক্ষেত্রে সংযোগ স্থাপন করেও প্রযুক্তি স্থানান্তরের সুযোগ তৈরী করা যায়।

(চ) দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণ উৎসাহিত করে

বহুজাতিক কোম্পানীগুলো যেন দেশে ও বিদেশে স্থানীয় কর্মচারী ও ব্যবস্থাপকদের কর্মক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের ব্যাপারে উৎসাহিত হয়, সে জন্য দেশে বিদেশী কর্মচারীদের আয়কে আয়কর মুক্ত ও বিদেশে কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য যে খরচ হয় আয় থেকে তার সমপরিমাণ বা কয়েকগুণ অর্থকে কর অব্যাহতি দেয়া যেতে পারে। এভাবে দেশীয় কর্মীদের প্রশিক্ষণ উৎসাহিত করে প্রযুক্তির যে অংশ হাতে কলমে শিখতে হয় তার স্থানান্তর উৎসাহিত করা যায়।

(ছ) কৌশলগত যৌথ প্রতিষ্ঠান (Strategic Alliance) গঠন উৎসাহিত করে

সাম্প্রতিককালে অধিকাংশ উচ্চ প্রযুক্তি সম্পন্ন (high-tech) পণ্যের জীবনচক্র সংক্ষিপ্ত হয়ে এসেছে। আবার এসব দ্রব্য আন্তঃ বিভাগীয় (interdisciplinary) প্রকৃতির যাদের উৎপাদন অত্যন্ত ব্যয়বহুল, ঝুকিপূর্ণ এবং উৎপাদনের জন্য একাধিক বিষয়ের প্রযুক্তির দরকার হয় (যেমন mechatronics দ্রব্য উৎপাদনের জন্য

যন্ত্রকৌশল ও তড়িৎকৌশল উভয় বিষয়ের প্রযুক্তি দরকার হয়, biotech দ্রব্য উৎপাদনের জন্য ফার্মাসিউটিক্যালস, রসায়ন, কৃষি, চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের প্রযুক্তির দরকার হয়। এধরনের উচ্চ প্রযুক্তি সম্পন্ন (high-tech) দ্রব্য উৎপাদনের জন্য বহুজাতিক কোম্পানীগুলো সাথে যৌথ প্রতিষ্ঠান (strategic Alliance) গড়ে তুলতে পারলে দ্রুত প্রযুক্তি শেখা অনেক সহজ সাধ্য হবে। এর মাধ্যমে দেশী বিনিয়োগকারীদের প্রযুক্তি শেখার পাশাপাশি বিনিয়োগের ঝুঁকি কমবে, বিনিয়োগযোগ্য তহবিলের প্রয়োজনীয়তা কমবে এবং আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতা করার ক্ষমতা বাড়বে। তবে বহুজাতিক কোম্পানীগুলোর সাথে যৌথ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে যথেষ্ট উন্নত হতে হবে। আর এজন্য দরকার সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা।

সরকার আর্থিক সহযোগিতার মাধ্যমে এ ব্যাপারে ভূমিকা রাখতে পারে। এছাড়াও সরকার বিদেশী ফার্মগুলোকেও অধিকহারে আর্থিক ও অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা দিয়ে দেশীয় ফার্মগুলোর সাথে যৌথ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে উৎসাহিত করতে পারে।

(জ) উপাদানের দামের অনুপাত পরিবর্তন করে

যেহেতু দেশে শ্রমিকদের দক্ষতার স্তর অত্যন্ত নিম্ন পর্যায়ের, প্রযুক্তির স্থানান্তর বাড়ানোর জন্য দেশে খুব বেশী আধুনিক প্রযুক্তির প্রবেশ উৎসাহিত করার পরিবর্তে কম আধুনিক প্রযুক্তির প্রবাহ উৎসাহিত করা প্রয়োজন। এতে শ্রমিকেরা দ্রুত প্রযুক্তি আয়ত্ব করতে পারবে। এবং স্থানান্তর ত্বরান্বিত হবে। প্রযুক্তি অত্যন্তআধুনিক হলে কম দক্ষ ও প্রশিক্ষিত শ্রমিকদের পক্ষে তা আয়ত্ব করা দূরূহ হবে এবং প্রযুক্তির স্থানান্তর বিলম্বিত হবে। আবার উদ্বৃত্ত শ্রম ব্যবহারেরও সুযোগ তৈরী হবে না। এছাড়াও অত্যাধুনিক প্রযুক্তি কম শ্রমঘন বলে শ্রমিকদের শেখার সুযোগও সীমিত হবে বলে প্রযুক্তির স্থানান্তরের সুযোগও সীমিত হয়ে পড়বে। সরকার শ্রম ও মূলধনের দামের (অর্থাৎ মজুরী ও সুদের হারের) অনুপাতের পরিবর্তন করে কম আধুনিক শ্রমঘন প্রযুক্তির স্থানান্তর উৎসাহিত করতে পারে। যদি বহুজাতিক কোম্পানীগুলো স্থানীয় ব্যাংকিং ব্যবস্থার উপর পুঁজি সংগ্রহের ব্যাপারে যথেষ্ট পরিমাণ নির্ভরশীল হয় তবে সুদের হার বাড়িয়ে শ্রম ভিত্তিক কম আধুনিক প্রযুক্তির শিল্প স্থাপন উৎসাহিত করা যায়। এতে প্রযুক্তির স্থানান্তর বাড়বে। তবে শ্রমিকদের দক্ষতার স্তর উন্নত হলে তা আরও উন্নত করার জন্য দীর্ঘমেয়াদে অধিকতর আধুনিক প্রযুক্তির স্থানান্তর উৎসাহিত করতে হবে পুনরায় উপাদানের দামের অনুপাত পরিবর্তন করে।

এছাড়াও বহুজাতিক কোম্পানী থেকে প্রযুক্তি শেখার পর যে সব দক্ষ ও অভিজ্ঞ কর্মীরা এসব কোম্পানী ত্যাগ করে নতুন (spin off) ফার্ম গড়ে তুলতে চায়, তাদের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ও কম সুদে মূলধনের যোগান দিয়ে নতুন ফার্ম

প্রতিষ্ঠা তথা প্রযুক্তি স্থানান্তর উৎসাহিত করা যায়। বহুজাতিক কোম্পানী ত্যাগ করে যে সব দক্ষ শ্রমিক অনুকরণ প্রকৌশলের মাধ্যমে একই বা সামান্য পরিবর্তিত ধরনের প্রযুক্তি তৈরী করতে চায় তাদেরকেও আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে প্রযুক্তির স্থানান্তর ত্বরান্বিত করা যায়।

আমাদের মত দেশের পক্ষে সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণে বহুজাতিক কোম্পানীগুলো থেকে প্রযুক্তির স্থানান্তর উৎসাহিত করার জন্য সকল খাতে একই সাথে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করা সম্ভব নয়। এজন্য একেক দশকে একেকটি শিল্পকে আর্থিক সহায়তার আওতায় আনা সমীচিন। ঐ দশকের জন্য নির্বাচিত শিল্পে প্রযুক্তি স্থানান্তরের জন্য বহুজাতিক কোম্পানীগুলোকে উপরে উল্লেখিত বিষয়গুলো উৎসাহিত করার জন্য পর্যাপ্ত আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে দেশে বহুজাতিক কোম্পানীগুলোর মাধ্যমে প্রযুক্তির সরবরাহ বাড়ানোর জন্য দেশে বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের পরিবেশ সৃষ্টি করা ও প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এব্যাপারে সরকার নিচের বিষয়গুলোর দিকে মনোযোগ দিতে পারেঃ

(ক) নতুন নতুন রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল (EPZ) নির্মাণ ও তাতে দ্রুত ইউটিলিটি সার্ভিস পাবার বিষয়টি নিশ্চিত করা।

(খ) বিনিয়োগ বোর্ডসহ বিভিন্ন রেগুলেটরী এজেন্সীর সেবার মান উন্নত করা। এসব অফিসে বিনিয়োগ নিবন্ধনসহ বিভিন্ন ধরনের ছাড়পত্র (clearance) প্রাপ্তির ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রিতা, হয়রানি, ও দুর্নীতি দূর করা।

(গ) মুনাফা ও উদ্বৃত্ত ফান্ড স্থানান্তর সহজ সাধ্য ও নিয়ন্ত্রণযুক্ত করা।

(ঘ) সামষ্টিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা ও টাকার ক্রমাগত অবমূল্যায়ন বন্ধ করা।

(ঙ) বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত ব্যবসায়িদের ফোরামে ও মিডিয়াতে বাংলাদেশে বিনিয়োগের সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে ব্যাপকভাবে প্রচার করা।

(চ) পুঁজি বাজার ও ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে আরও দক্ষ করা যাতে বিদেশীরা অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে পর্যাপ্ত মূলধন আহরণের সুযোগ পায়।

(ছ) রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা।

(জ) আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন ঘটানো।

(ঝ) বেসরকারিকরণ প্রক্রিয়া আরও জোরদার করা।

(ঞ) প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা জোরদার করার মাধ্যমে উদ্যোক্তা গড়ে তোলা।

(ট) দেশে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে আরও ট্রেনিং সেন্টার, ইন্সটিটিউট ও বিশেষায়িত ইন্সটিটিউট ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা।

(ঠ) বিদেশে অর্থনৈতিক কূটনীতি জোরদার করা।

(ড) রপ্তানীকে আর্থিক সহযোগিতার মাধ্যমে আরও উৎসাহিত করা।

(ঢ) দেশে ইন্টারনেট (Internet) এর মাধ্যমে তথ্যের প্রবাহ (অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী) জোরদার ও কম ব্যয়বহুল করা।

(ণ) প্রতিবেশী দেশগুলোর বৈদেশিক বিনিয়োগের নীতিমালা পর্যালোচনা করে এসব দেশের চেয়ে বিদেশী বিনিয়োগ কারীদের অধিকতর আকর্ষণীয় সুযোগ সুবিধা প্রদান করা ও তার প্রচার করা।

৬। উপসংহার

বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ (FDI) কে আধুনিক প্রযুক্তি স্থানান্তরের জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আমাদের মতো দেশের জন্য বৈদেশিক বিনিয়োগ কম খরচে প্রযুক্তি শেখা ও লাভ করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। এশিয়ার উদীয়মান অর্থনৈতিক শক্তসমূহ যেমন মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, তাইওয়ান, দক্ষিণ কোরিয়া, থাইল্যান্ড, হংকং এমনকি পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত বৈদেশিক বিনিয়োগ থেকে প্রযুক্তির উন্নয়ন ও উদ্ভাবনে তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি লাভ করেছে। অনুরূপ অগ্রগতি লাভ করতে হলে আমাদেরও দেশে বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিবেশ তৈরী করতে হবে এবং মানব সম্পদের উন্নয়নের মাধ্যমে প্রযুক্তি গ্রহণের ক্ষমতা বাড়াতে হবে। এছাড়াও বৈদেশিক বিনিয়োগকে যথাযথভাবে আর্থিক সহায়তা ও সীমিতভাবে নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। অন্যথায় বিদেশী বিনিয়োগের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত শিল্প কারখানাগুলো কেবলমাত্র যন্ত্রাংশ জোড়া দেওয়ার স্থানে (assembling centre) পরিণত হবে যেখানে স্থানীয়ভাবে কোন কিছু উৎপাদন না করে বা দ্রব্যের অত্যন্ত সামান্য অংশ উৎপাদন করে ও অবশিষ্ট যন্ত্রাংশ আমদানী করে কেবলমাত্র সংযোগ সাধন করে দ্রব্য বাজারে ছাড়া হবে। যদি বিদেশী বিনিয়োগ এরকম সেন্টারে পরিণত হয়, তবে সেই বিনিয়োগ থেকে প্রযুক্তি স্থানান্তরের সম্ভাবনা তিরোহিত হবে। এরূপ বিনিয়োগ থেকে স্থানীয় জনগণ প্রযুক্তি আয়ত্ব করার কোন সুযোগ পাবে না, কিন্তু বিদেশী বিনিয়োগকারীরা বাজার দখল করে অর্জিত মুনাফা তাদের সদর দফতরে স্থানান্তরের সুযোগ নেবে।

বৈদেশিক বিনিয়োগ থেকে দেশ প্রযুক্তি শেখা বা প্রযুক্তি লাভের সুযোগ হারালে দীর্ঘমেয়াদে প্রযুক্তির জন্য বহুজাতিক কোম্পানীগুলোর উপর দেশ চির নির্ভরশীল

হয়ে পড়বে এবং দেশে প্রযুক্তির উন্নয়ন ও উদ্ভাবনের সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে যাবে। প্রযুক্তিগত ক্ষমতার এই বৈষম্য উন্নত দেশের সাথে আমাদের মাথা পিছু আয়ের ব্যবধান ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি করবে। কাজেই এ ব্যাপারে সরকারের সতর্ক হওয়া প্রয়োজন এবং প্রযুক্তি শেখা ও লাভের এই গুরূত্বপূর্ণ মাধ্যমটির সুযোগ যথাযথভাবে কাজে লাগানো প্রয়োজন।

গ্রন্থপঞ্জি

Abdullah, M. (2001), *Foreign Direct Investment and Technology Transfer: A Study on Electrical Appliance Industry of Thailand*, A un published Master's thesis submited to School of Management, Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand.

Baranson, J., (1970), Technology Transfer Through the International Firm, *American Economic Review*, Vol.60,

p 435-440

Chen, E. K. Y., (1996), Transnational Corporations and Technology Transfer to Developing Countries, in *Transnational Corporations and World Development, Published* by Routledge on behalf of UNCTAD Division on Transnational Corporations and Investment.

Chng, M.K., Low, L., Tay, B.N, and Tyabji, A., (1986), *Technology and Skills in Singapore*, Singapore, Institute of Southeast Asian Studies.

Dunning, J.H, (1994), Multinational enterprises and the globalization of innovatory capacity, Research Policy, Vol. 23 p 67-88, Elsevier Science Publishers, North Holland

Dunning, J.H., (1993), Multinational *Enterprise and Global Economy*, Addison- Wesley, Reading, MA

Haque, I, et al (1995), *Trade, Technology and International Competitiveness*, EDI Development Studies, The Word Bank, Washington.

Hobday, M., (2000), Innovation in Southeast Asia: Lessons for Europe? In Haley, U.C. (2000) (ed.) *Strategic Management in the Asia Pacific, Harnessing Regional and Organizational Change for Competitive Advantage,* Oxford, Butterworth, Heinemann

Lall, S. (1987), *Learning to Industrialize: The acquisition of Technological Capability by India.* London: Macmillan,

Lall, S. (1992), Technological Capabilities and Industrialization. *World Development*, Vol. 20, No 2, 1992 p. 165-186

Lall, S. (1993), Understanding Technology Development. *Development and Change*, Vol. 24, 1993, p. 719-753

Lall, S., (1985), *Multinationals, Technology and Export*, London, Macmillan.

Pavitt, K., (1985), The Industrially Advanced Countries: An Overview in Nathan Rosenberg and Claudio Frischtak (ed.) *International Technology Transfer: Concepts, Measures, and Comparison*, Praeger

Quinn, J.B., (1969), Technology Transfer by Multinational Companies, *Harvard Business Review,* 47/6: 75-89.

Rahman, M.M., Abdullah, M., Rahman, A.K.M.M., and Ahmed, M., (2002), Some Observations on Technology Transfer in an Export Processing Zone of Bangladesh, published in the Proceedings of the International Conference on Manufacturing 2002 held in Dhaka, Organized by IPE, BUET..

Reddy, N. M. and Zhao, L., 1990. International Technology Transfer: A Review, *Research Policy,* 19: 285-307

UNCTAD, 1995. *World Investment Report 1995: TNCs and Competitiveness*, United Nations, New York and Geneva

UNCTAD, 1998. *World Investment Report* 1998: Trends and Determinants, United Nations, New York and Geneva

UN-ESCAP (1988). *Transnational Corporations from Developing Asian Economies, Host Country Perspective.*

UN-ESCAP/APCTT, 1987. An Overview of the Framework for Technology Based Development, Technology Atlas Team, Special Issue on Technological Capabilities Assessment in Developing Countries, *Technological Forecasting and Social Change*, 32/1:1-109

WTO, 1996. *Annual Report: Trade and Foreign Direct Investment*, World Trade Organisation, Geneva

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা,
সপ্তম বর্ষ সংখ্যা কার্তিক ১৪০৯

মধ্যস্বত্ব* অধিগ্রহণ ও বাংলাদেশে সামাজিক পরিবর্তন

মোঃ মাহমুদ হাসান **

The State Acquisition and Social Change in Bangladesh

Md. Mahmud Hasan

Abstract: Social change or the change of social structure actually involves social relationships. Social relationship takes place due to many causes, one of which is production relation. With the introduction of the Permanent Settlement in 1793 in this sub-continent the pattern of the ownership of property drastically changed; the Zamindars became the owner of land, and the common people and the actual farmers did not have any right to the ownership of land. This system of land ownership contributed to the emergence of many intermediate interest classes resulting in uneven, unequal pattern of social relationship and feudal mode of production in the society. Before the departure of the British Government from India, Flaud Commission was formed to mitigate the gaps between the Zamindars and the Riyats, and following the recommendations of the Commission in 1950, the "State Acquisition and Tenancy Act" was passed by the Parliament. This act shattered the Zamindary system as well as the intermediate classes. After the independence of Bangladesh, a series of land laws was enacted, but the production relation did not improve where agrarian relation could be observed free from semi-feudal, semi-colonial culture and values. This article is an attempt to explore the process of social change, specially in terms of agrarian relation, in Bangladesh.

পটভূমিকা

বিশ্বব্যবস্থা তত্ত্বের বিখ্যাত তাত্ত্বিক ও সমাজবিজ্ঞানী ইমানুয়েল ওয়ালারস্টাইলের মতে সামাজিক কাঠামো পরিবর্তনের মূলে, কী ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায়, কী সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায়, রাষ্ট্রযন্ত্রই মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। ধনতান্ত্রিক বিশ্বে পুঁজি সঞ্চয়ন, পুঁজির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ, অনুন্নত দেশ থেকে পুঁজি লুণ্ঠন, মাঝারি ও ভারী শিল্প স্থাপন এবং বহির্বিশ্বে পুঁজিবাজার সম্প্রসারণসহ ধনতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে পশ্চিমা ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রযন্ত্র প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে

* রাষ্ট্রীয় বা জমিদারী অধিগ্রহণের পরিবর্তে 'মধ্যস্বত্ব' প্রত্যয়টি এখানে ব্যবহৃত হয়েছে এ জন্য যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের ফলে সৃষ্ট বহু মধ্যস্বত্বভোগী স্বার্থ ও অন্যান্য কতিপয় ভূমিকর স্বার্থ ও স্বত্ব রাষ্ট্র কর্তৃক অধিগ্রহণের ফলে বিলুপ্ত হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে এসব. মধ্যস্বত্ব ও স্বার্থ বিলুপ্ত করে কৃষকশ্রেণীকে জমির মালিকানা প্রদানপূর্বক সরকার ও কৃষকের মধ্যে ভূমিসংক্রান্ত স্বার্থ বিষয়ে সুনির্দিষ্টভাবে সম্পর্ক রচনার জন্য এ আইন প্রণয়ন করা হয়। জমিদারী তথা মধ্যস্বত্ব বিলোপই এর অন্যতম প্রধান দিক; অপরটি হলো প্রজার তথা কৃষকের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়. আমরা এ বিবেচনায় 'রাষ্ট্রীয়' শব্দের পরিবর্তে বিষয়বস্তুর সাথে সংগতিপূর্ণ 'মধ্যস্বত্ব' প্রত্যয়টি এ প্রবন্ধে ব্যবহার করেছি।

** উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।

প্রণোদনা ও নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যব্যবস্থা সব সময়ই অব্যাহত রেখেছে। অপরদিকে সামন্ততান্ত্রিক কৃষিভিত্তিক সমাজকাঠামো ভেংগে খামারভিত্তিক কৃষিব্যবস্থার পত্তন, রাষ্ট্রীয় সর্বাত্মক নিয়ন্ত্রণমুখী সমাজতান্ত্রিক সমাজ বিনির্মাণের ক্ষেত্রে সাম্যবাদী ও সমাজতান্ত্রিক কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রই প্রধান ভূমিকা পালন করেছে। এ দুই ব্যবস্থার সমর্থনে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নানাভাবে, নানানামে অনেক সংগঠনের জন্ম হয়েছে, তাদের ধ্যান-ধারণা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলেছে; এবং কথিত ঐ দুই বিশ্ব ব্যতীত বাকি বিশ্ব, যাকে তৃতীয় বিশ্ব বলে চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়, আদর্শের বিশ্বাসে দোলায়িত হয়েছে। এক ধরনের অতলান্ত, অধরা ও ঐন্দ্রজালিক বাতাবরণের বিশ্বাসে শেষোক্তবিশ্বের অন্তর্গত বাংলাদেশও বাদ যায়নি সে নেকাবে ঢাকতে। কিন্তু, যা পূর্বেই উক্ত হয়েছে, বাংলাদেশের রাষ্ট্রযন্ত্র ও রাজনৈতিক ক্ষমতাগোষ্ঠী, তা সরকার পরিচালনায় যুক্ত হোক বা বহির্ভূত হোক, সমাজ কাঠামো পরিবর্তনে কখনো বাস্তবসম্মত স্থায়ী ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সমর্থ হয়নি।

বিদ্যমান সমাজ. কাঠামোর প্রত্যাশিত, পরিশীলিত ও পরিমার্জিত বিন্যাসের ক্ষেত্রে রক্ষণশীল রাজনৈতিক কর্তৃত্বশীল গোষ্ঠী জনগণকে আপেক্ষিক পরিবর্তনের প্রতি আকৃষ্ট করেছে বারবার, কিন্তু বিশ্বাসের ক্ষেত্রে সমাজ কাঠামোর আমূল পরিবর্তনমুখীতার প্রতি তাদের অবিশ্বাস এবং ক্ষেত্র বিশেষে বিরোধীতার কারণে সমাজকাঠামোর আমূল পরিবর্তন সংঘটিত হয়নি। অন্যদিকে বিপ্লবী ধ্যান-ধারণায় তথা আমূল পরিবর্তন প্রত্যাশী ক্ষমতাহীন তথা ক্ষমতাবহির্ভূত রাজনৈতিক শ্রেণীর বিশ্বাস ও তাদের কার্যাবলী ব্যাপক জনগণকে আস্থাশীল ও আগ্রহশীল করার ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছে এবং তাদের কোন কোন কৌশল, যেমন শ্রেণীশত্রু খতমের নামে চরমপন্থা অবলম্বনপূর্বক সন্ত্রাসী আচরণ, গুপ্তহত্যা, জনমনে ত্রাস কায়েম ইত্যাদি সিংহভাগ জনগণ থেকে তাদের দূরে ঠেলে দিয়েছে। বাংলাদেশের সমাজকাঠামোর পরিবর্তনের ক্ষেত্রে গৃহীত কার্যব্যবস্থার একটা বড় দুর্বলতা হলো, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উপাদানকে কম গুরুত্ব দিয়ে শুধু অর্থনৈতিক প্রেষণার (Economic Motivation) প্রতি বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।[১]

সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তনের উপর্যুক্ত বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিতের আলোকে ১৯৫০ সালের মধ্যস্বত্ব অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন পর্যালোচনার দাবী রাখে। একথা অনস্বীকার্য যে, সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে মার্কসীয় ও ধনবাদী মূল্যবোধের বিশ্লেষণের প্রতি সমাজবিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় যেখানে প্রথমোক্ত ধারার বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে উৎপাদন পদ্ধতি, উৎপাদন সম্পর্ক ও উৎপাদন শক্তির

১. রহমান, আসহাবুর ঃ বাংলাদেশের কৃষি কাঠামো কৃষক সমাজ ও উন্নয়ন, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, জুলাই ১৯৮৬, পৃষ্ঠা ১২৮-১২৯।

রূপান্তরের কারণে সামাজিক পরিবর্তন সূচিত হয় বলে মনে করা হয়। দ্বিতীয়োক্ত মূল্যবোধের ক্ষেত্রে, যা অনেকটা মার্কসীয় মূল্যবোধের বিরোধীতা থেকে উৎসারিত, ব্যক্তিগত সঞ্চয়, পুঁজি, আগ্রহ ও মানবীয় প্রচেষ্টাকে পবিত্র জ্ঞান করা হয় এবং ব্যক্তিগত মালিকানার উদ্যোগকে স্বাগত জানানো হয়। ব্যক্তিগত লাভালাভ, ব্যক্তিগত প্রণোদনা ও ব্যক্তিগত মালিকানার চরম উৎকর্ষ সাধনের ধারাবাহিকতায় সামাজিক সংস্কার ও পরিবর্তন সূচিত হয় বলে বিবেচনা করা হয়। এ চিন্তাধারার একজন প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী মাক্সওয়েবার। তাঁর মতে প্রোটেস্ট্যান্ট মূল্যবোধই ইউরোপে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা বিকাশের জন্য দায়ী।

সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কোন কোন সমাজবিজ্ঞানী 'এশীয় উৎপাদন' প্রত্যয় ব্যবহার করে বাংলা-ভারতের সমাজ ব্যবস্থাকে বিশ্লেষণ করার প্রয়াস পেয়েছেন। কেউ কেউ একে 'জলসেচ ভিত্তিক' (Hydraulic Society) সমাজ বলে অভিহিত করেছেন। 'এশীয় উৎপাদন' প্রত্যয় ব্যবহার করার কারণ হিসেবে বলা হয়েছে যে, এখানে ধনতন্ত্র যেমন বিকশিত হয়নি, সমাজতন্ত্রও তেমনিভাবে বিকশিত হয়নি যেমনটা হয়েছিল পাশ্চাত্য সমাজ ব্যবস্হায়। মূলত বিকশিত ভিন্নতর সমাজ ব্যবস্হাকে কার্ল মার্কস ও মার্কসপন্থীরা এশীয় উৎপাদন প্রত্যয়যোগে একে ব্যাখ্যা করেছেন। তবে জলসেচ ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্হাকে খানিকটা যুক্তিযুক্ত বলে অভিহিত করার পশ্চাতে অনেকের সমর্থন এখানে যে, নদীবেষ্টিত বাংলা-ভারতের উৎপাদন জলসেচ নির্ভর ছিল এবং গ্রামগুলো ছিল অনেকটাই স্বয়ংসম্পূর্ণ। এ গ্রাম সম্প্রদায় একমাত্র লবণ ব্যতীত আর সব কিছুই উৎপাদন করত বলে বর্ণনা করা হয়। বলা বাহুল্য, এ অঞ্চলের শিল্প-সভ্যতা তৎকালীন বিশ্বে ঈর্ষনীয় ছিল বলে ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় বাংলার বস্ত্রশিল্প মসলিনের মাধ্যমে। বাংলার বস্ত্র শিল্পীরা অতি উন্নতমানের মসলিন উৎপাদন করত যা সারা বিশ্বে রফতানি করা হত। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সাম্রাজ্যবাদী ও ঔপনিবেশিক সরকার বাংলা- ভারতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তারা এ দেশ থেকে সম্পদ পাচার করে নিয়ে যায় এবং এদেশের শিল্পের বাজার ধ্বংস করার জন্য তারা এ দেশীয় শিল্পকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেয়। ইংরেজদের নীল নকশার অংশ হিসেবে তারা এ দেশীয় মসলিন শিল্পের কারিগর ও শিল্পীদের হাত কেটে দেয় যাতে শিল্পকৌশল চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে যায়। এ ষড়যন্ত্রের ফলে বিশ্বখ্যাত মসলিন শিল্প বিলুপ্ত হয়ে যায়। অপরদিকে বাংলা-ভারতকে তারা ইংল্যান্ডে প্রতিষ্ঠিত শিল্পের কাঁচামালের বাজার (Hinterland) হিসেবে গড়ে তোলে। এদেশ থেকে কাঁচামাল নিয়ে ইংল্যান্ডের শিল্প কারখানায় ব্যবহৃত হয়ে আবার শিল্পপণ্য হিসেবে তা বাংলা-ভারতে ফিরে আসত চড়া মূল্যে বিক্রি হবার জন্য।

ইংরেজদের সাম্রাজ্যবাদী কালো থাবা যদি বাংলা-ভারতকে স্পর্শ না করত তাহলে বাংলা-ভারতের উৎপাদন ব্যবস্থা উন্নততর হতে পারত বলে প্রমাণিত হয়। স্থাপত্য শিল্পে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে উপমহাদেশীয় উৎকর্ষ বিশ্বের সর্বোৎকৃষ্ট স্থান অধিকার করেছিল। তাজমহল নির্মাণের পিছনে ২২ হাজার শ্রমিকের ২২ বছর লেগেছিল এটা যেমন সত্য, তেমনি এও সত্য যে, তদানীন্তন স্থাপত্যশিল্পের শ্রেষ্ঠত্বের এ এক উজ্জ্বল নিদর্শন। মুঘল সম্রাটের ময়ূর সিংহাসন ইংল্যান্ডে যেভাবে নেয়া হলো, তা চৌর্যবৃত্তি ব্যতীত অন্য কিছু নয়; কিন্তু সভ্যতার এতসব নিদর্শন, শিল্পের এত কৌশল, সুন্দরের এত আয়োজন হন্তারকের হাতে পড়ে সবই জবাই হয়ে গেল, জগৎবিখ্যাত সভ্যতার মৃত্যুবিবরে জন্ম নিল সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতার 'নীল নক্সার নব্য সংস্কৃতি'।

ঔপনিবেশিক হামলায় ও ধ্বংসে প্রায় পুরো দু'শ বছরে বাংলা-ভারত বিরান হয়ে গেল। পূর্বের জনকল্যাণমূলক স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ সমাজ ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেল; চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের লীলাখেলায় কৃষক সমাজ বহু স্বার্থগোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে অসম সামাজিক সম্পর্কের পরস্পর দ্বন্দ্বমূলক অবস্থানে এসে দাঁড়িয়ে গেল, উৎপাদন ব্যবস্থায় সামন্ততান্ত্রিক উপাদান কায়েম হয়ে গেল। ভূমিদাস ব্যবস্থাও কোথাও কোথাও চালু হয়ে গেল; এক ধরনের সামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতির আবহ সমাজের নাড়িমূলে প্রোথিত হয়ে গেল। পাশ্চাত্যের প্রভু-দাস সংস্কৃতির সয়লাবে বাংলা-ভারতের সাম্যবস্থামূলক সামাজিক সম্পর্ক ধ্বংস হয়ে তদস্থলে জন্ম নিল অসম ও বৈষম্যমূলক সামাজিক সম্পর্ক। এ লন্ডভন্ড সমাজ ব্যবস্থার বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে প্রথম বারের মত স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ হয়ে গেল ১৮৫৭ সালে এ দেশের দেশপ্রেমিক সিপাহীদের নেতৃত্বে (যাকে ইংরেজরা সিপাহী বিদ্রোহ বলে গালি দিয়েছে)। টিপু সুলতানের স্বাধীনতা সংগ্রাম, হাজী শরিয়তুল্লাহর সংগ্রাম, তীতুমীরের বাঁশের কেল্লা, ফরায়েজী আন্দোলন, তেভাগা আন্দোলন ইত্যাদি এ বৈষম্যমূলক সামাজিক সম্পর্ক অবসানের উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয়েছিল। কিন্তু রাজনৈতিক প্রয়োগ ব্যতীত আমদানী করা সাম্রাজ্যবাদী বিদেশ সংস্কৃতির সম্পর্কের অবসান ঘটানো ছিল প্রায় অসাধ্য ব্যাপার।

বাংলা-ভারতের সমাজকাঠামোর পরিবর্তনের অধ্যয়নে উপর্যুক্ত ঐতিহাসিক ঘটনাবলী অবশ্যই অনুধ্যেয় ও বিবেচ্য, যেমনটি সমাজবিজ্ঞানী জর্জ জোলস্যান ও ওয়াল্টার হির্স মনে করেনঃ

'The dynamics of society may seem like merely a pretentious way of talking about history. It is, however, history with a difference; history conceived not as narrative or chronicle, not even as a connected story or tale, but history conceived as a system, that is, as a social system with

emphasis on regularities and patterns as well as discontinuities and gaps'.[2]

যে বাংলা বৃটিশ আগমনের পূর্বে ছিল সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা, মানুষের জীবনে ছিল পরিমিত স্বাচ্ছন্দ্য ও পর্যাপ্ত স্বচ্ছলতা, সামাজিক সম্পর্ক ছিল পারস্পরিক সহনশীলতার মোড়কে আচ্ছাদিত, উৎপাদন সম্পর্ক ছিল না ধনতান্ত্রিক, না সাম্রাজ্যবাদী, কোম্পানীর শাসন এসে সে উৎপাদন সম্পর্ককে বদলে দিলো সামন্ততান্ত্রিক-ধনতান্ত্রিক অভিধায়। ১৯৪৭ ও ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পরও বাঙালির মনস্তত্ত্বে ঢুকে যাওয়া সামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতি পরাজিত হয়নি বলে সাম্রাজ্যবাদের রমরমা সময়ে জমিদারের খাজনা আদায়ের জন্য প্রণীত 'পাবলিক ডিমান্ড রিকভারি এ্যাক্ট-১৯১৩' এখনো চালু রয়েছে। মধ্যস্বত্ব বিলুপ্ত হলেও এখনো বর্গাপ্রথা সগর্বে আইনী মহিমায় সমাসীন। ভূমিহীনদের সংখ্যা ক্রমাগতভাবে উদ্বেগজনকহারে বেড়েই চলেছে; আপেক্ষিক দারিদ্রই (Relative Poverty) শুধু নয়, নিরেট দারিদ্রও (Absolute Poverty) অপ্রতিহত গতিতে বেড়ে চলেছে।

মধ্যস্বত্ব অধিগ্রহণের যৌক্তিক কারণ

সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার গর্ভে জন্ম নেয়া দুঃখ-কষ্ট, ঔপনিবেশিক শোষণ ব্যবস্থা জমিদারী প্রথার নিষ্ঠুর পীড়ন ও শোষণ থেকে মুক্তি পেতে বাংলার মুক্তিকামী মানুষেরা অতীতে বহুবার সংগঠিত হয়েছে, কৃষক সংগ্রাম ও নানা আন্দোলন গড়ে তুলেছে। বিশিষ্ট সমাজচিন্তাবিদ কামাল সিদ্দিকীর ভাষায়, 'ভারবাহী পশুর মত হাশেম শেখ আর পরাণ মন্ডল শত শত বর্ষ ধরে কঠিন মাটির বুকে হাল চালিয়েছে, সোনালী ফসল কেটে জমিদার জোতদারের গোলায় তুলে দিয়েছে, আকাল দুর্ভিক্ষে ধুকে ধুকে মরেছে অথবা গ্রাম উজাড় করে শহরের বস্তিতে আশ্রয় নিয়েছে; আর কখনও কখনও জীবনধারণের গ্লানি অসহ্য হয়ে উঠলে তীতুমীরের বাঁশের কেল্লা থেকে যুদ্ধ করেছে, নীলকরদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হয়েছে, অথবা তেভাগা আন্দোলনে দলে দলে প্রাণ দিয়েছে'।[৩] এসব আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল শ্রমশোষণ থেকে মুক্তিলাভ ও অর্থনৈতিকভাবে সুবিচার প্রতিষ্ঠা। কৃষিভিত্তিক বাংলার সমাজ ব্যবস্থার উৎপাদন শক্তির মূলই হল বাংলার কৃষক সমাজ যারা উৎপাদনের

---

[2] Zollschan, George and Hirsh, Walter: Social Change, Explorations, Diagnoses and Conjectures, Schenkman Publishing Company, New York, 1976, page-7.

[৩] সিদ্দিকী, কামাল ঃ বাংলাদেশে ভূমি সংস্কারের রাজনৈতিক অর্থনীতি. ভূমিকা পৃষ্ঠা-আট, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা সংস্থা, ঢাকা, আগষ্ট ১৯৮১।

চাকাকে সচল রেখেছিল; কিন্তু তারাই ছিল চিরবঞ্চিত। ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথার প্রবর্তনের ভিতর দিয়ে বাংলার সমাজব্যবস্থায় শ্রেণী বৈষম্যের ও অসম সামাজিক সম্পর্কের সৃষ্টি করা হয় যেখানে সরকার ও জমিদার শ্রেণী কৃষককূলকে শাসন ও শোষণের আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছিল। কিন্তু পরিবর্তন প্রয়াস থেমে থাকেনি, ১৯৫০ সালে মধ্যস্বত্ব (জমিদারী) অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব (State Acquisition And Tenancy Act) আইনের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক পরিবর্তন সংঘটিত হয়। বলা বাহুল্য, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও মধ্যস্বত্ব অধিগ্রহণের মাঝখানে রায়তের নিরাপত্তা ও সরকারের উপযুক্ত খাজনা পাওয়া এ দুই সমস্যার সমাধানে কিছু কিছু ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছিল, যেমন ১৮৫৯ সালের রাজস্ব আইন, ১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৩৮ সালের ষষ্ঠ আইন।[৪]

মধ্যস্বত্ব অধিগ্রহণের সময়ে বাংলার সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থা

বাংলায় বৃটিশ রাজত্ব শুরু হওয়ার পূর্বে জমির মালিকানা রাষ্ট্র বা জমিদার নামে অভিহিত কর গ্রহীতাদের হাতে ছিল না, বরং তা ছিল চাষী শ্রেণীর হাতে ন্যস্ত। ইংল্যান্ডে প্রচলিত ভূ-স্বামী প্রথার আদলে প্রথমে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরে ১৭৯৩ সালে ভূমিতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করা হয়। জমিদাররা স্বাধীন কৃষকের কাছ থেকে নয়, বরং নির্ভরশীল রায়তের কাছ থেকে খাজনা উসুল করত। এভাবে প্রাপ্ত খাজনার দশভাগের নয়ভাগই রাষ্ট্রকে দিতে হতো।[৫] চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থা প্রবর্তনের দ্বিবিধ উদ্দেশ্য ছিল। এক, জমিদারী চিরস্থায়ীভাবে বন্দোবস্তের মাধ্যমে রাজস্ব আদায়ের স্থায়ী ব্যবস্থা করা, অর্থাৎ ভূমি রাজস্ব আদায় ব্যবস্থাকে পাকাপোক্ত করার মাধ্যমে উপমহাদেশে বৃটিশ সরকারের অর্থনৈতিক ভিতকে মজবুত করা; এবং দুই, বাংলাদেশ তথা সমগ্র ভারত উপমহাদেশে পর্যায়ক্রমে বৃটিশের প্রতি অনুগত, বশংবদ এক শ্রেণী তৈরি করা যারা দৈহিক কাঠামোয় এ দেশীয় হলেও চিন্তা-চেতনায়, মনে-মগজে, বৃটিশ সরকারের একনিষ্ঠ সমর্থক ও এ দেশীয় এজেন্ট। এ দুই উদ্দেশ্যই পূরণ হলো চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে; কিন্তু ভূমি ব্যবস্থায় সৃষ্টি হলো অসংখ্য মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণী যা কৃষক শ্রেণীর ওপর নির্যাতনের ও শোষণের মাত্রাকে ক্রমাগত বৃদ্ধি করে চলল।

বৃটিশ কর্তৃক বন্দোবস্তকৃত জমিদারীর বাইরেও কিছু জমিদারী ব্যবস্থা বহাল ছিল যেগুলো মুঘল বাদশাগণ রাজানুগত্যের পুরস্কারস্বরূপ তাদেরকে দিয়েছিলেন। তবে এদের অধিকাংশই পরে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অধীনে চলে আসে। এছাড়া জমিদারী

---

[৪] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ১৩।

[৫] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ১৩।

চিরস্থায়ী করার কারণে কোথাও কোথাও সৃষ্ট অসন্তোষ প্রশমন করার জন্য অস্থায়ীভাবে বন্দোবস্ত করা জমিদারসহ খাসমহল নামে পরিচিত কিছু রাজ সরকারের জমিদারীও ছিল। সরকারকে বাৎসরিক নির্দিষ্টহারে খাজনা দেয়ার শর্তে জমিদাররা তাদের জমিদারী চালিয়ে যেতে লাগল। এদিকে জমি চাষের সাথে জমিদারের কোন সম্পর্ক রইলো না, বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যস্বত্বভোগীদের কাছে জমির স্বত্ব সম্প্রসারিত হয়ে গেল। দেখা যেত রায়ত শ্রেণী উপরায়তদের কাছে জমি বন্দোবস্ত দিত। এভাবে উপ-সামন্ত প্রথা এতদূর বিস্তৃত হয়েছিল যে কোনো কোনো অঞ্চলে একখন্ড জমির ওপর জমিদারের নীচে পর্যায়ক্রমে ৫০ জনের স্বত্ব ছিল।[৬]

রাষ্ট্র ছাড়াও বিভিন্ন পর্যায়ের লোকেরা ভূমির সংগে জড়িত ছিল, যাদের স্বার্থও ছিল বিভিন্ন প্রকারের, যেমন জমিদার, স্বত্বাধিকারী, উচ্চশ্রেণীর রায়ত (এরা নির্দিষ্টহারে খাজনা দিত ও মালিকানা ভোগ করত), নিম্নশ্রেণীর রায়ত (এরা উপরায়ত, এদের জমির মালিকানা স্বীকৃত ছিল না), বর্গাদার (ভাগচাষী) ও কৃষি-মজুর ইত্যাদি। মোদ্দাকথা, চিরস্থায়ী জমিদারীর কারণে ভূমির সাথে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বহু মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণীর সৃষ্টি হয় যারা কৃষি উৎপাদন কাঠামোয় এক সংকটাবর্তের জটিল জাল তৈরি করে। উৎপাদনের সাথে সম্পর্কহীন খাজনা আদায়কারী মধ্যস্বত্বভোগী পরগাছা শ্রেণীর শ্রেণী-চরিত্র সামন্তসমাজ ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে সর্বাংশে সাহায্য করে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মারাত্মক কুফল দেখা দেয়ার পরিপ্রেক্ষিতে স্যার ফ্রান্সিস ফ্লাউডের নেতৃত্বে ভূমি রাজস্ব কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয় যার মূল কাজ ছিল ক্ষতিপূরণসহ জমিদারী ব্যবস্থা ও মধ্যস্বত্বভোগ প্রথার উচ্ছেদপূর্বক বর্গাদার প্রথার উন্নতিবিধান। বলা নিষ্প্রয়োজন, জমিদারী ব্যবস্থা শুধু ভূমি ব্যবস্থার সাথেই সম্পৃক্ত ছিল না, সামাজিক, সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলেও তা এক জগাখিচুড়িমার্কা নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে। উৎপাদনের ক্ষেত্রে জমিদারী প্রথা মারাত্মক কুফল বয়ে আনে। জমির সাথে অর্থাৎ উৎপাদনের সাথে জমিদারদের কোন সম্পর্ক না থাকায় তারা শুধু খাজনা আদায়ের ক্ষেত্রে মনোযোগী হয়ে পড়ে এবং অত্যধিক মাত্রায় খাজনা আদায়ের ফলে কৃষককূল শোষিত হতে থাকে। অপরদিকে দেখা যায়, কোম্পানীর সরকার এদেশে রেলপথ চালু করার ফলে আবহমানকাল থেকে চালু থাকা নদীপথ গুরুত্ব হারায় এবং ব্যাপক নদীপথ ধ্বংস হয়ে যায়। বাংলা-ভারতের জলসেচভিত্তিক কৃষি ব্যবস্থা হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়লে স্বাভাবিক কারণেই বাংলায় উৎপাদন হ্রাস পায়। এতদ্ব্যতীত দুর্ভিক্ষের সময়েও জমিদারদের ভূমি রাজস্ব আদায়ে কোন ভাটা পড়েনি, বরং দুর্ভিক্ষের সময় ভূমি রাজস্ব আদায় অনেক গুণে বেড়ে যায়। এক হিসেবে দেখা যায় জমিদারী অধিগ্রহন ও প্রজাস্বত্ব আইন পাশের পূর্বে সরকার জমিদারদের নিকট থেকে মাত্র ১,৭৩,৩৮,০০০/- টাকা ভূমি রাজস্ব হিসেবে আদায়

[৬] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৩-১৪।

করতেন; অন্যদিকে ঐ সময়ে জমিদারগণ প্রজাদের নিকট থেকে আদায় করতেন ৮,৪০,০০,০০০/- টাকা।[৭] যাহোক, এদেশে ইংরেজ শাসনের ফলে কৃষিভিত্তিক সমাজ কাঠামোয় সামগ্রিক অর্থে ব্যাপক বিপর্যয় নেমে আসে যা থেকে মুক্তির উপায় হিসেবে জমিদারী বা মধ্যস্বত্ব উচ্ছেদের দাবী ওঠে। ১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান স্বাধীন দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, তদানীন্তন ভারত উপমহাদেশের বর্তমান বাংলাদেশ নানাভাবে শোষিত ও নির্যাতিত থাকার কারণে এখানকার বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক গোষ্ঠী মনস্তাত্ত্বিকভাবে অন্যায়ের ও শোসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিল। পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের পর গণদাবী ও আন্দোলনের স্রোতধারায় এবং ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের একশ্রেণীর গণমুখী নেতৃত্বের কারণে মধ্যস্বত্ব বা জমিদারী অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন পূর্ববঙ্গ পরিষদে পাস হয়ে যায়। এ আইন পাসের ফলে এদেশ হতে জমিদারী প্রথা অর্থাৎ ভূমির মধ্যস্বত্ব ব্যবস্থার অবসান ঘটে।

মধ্যস্বত্ব অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের বৈশিষ্ট্য

একথা মানতেই হবে যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জরাজীর্ণ বাংলার আকাশে মধ্যস্বত্ব অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন শুধু ঐ সময়ের জন্য নয়, বরং বর্তমান অবধি এক যুগান্তকারী ও ঐতিহাসিক ঘটনা।

এ আইনের মাধ্যমে প্রধানত তিনটি কাজ সম্পন্ন করা হয়। (এক) মধ্যস্বত্ব অধিগ্রহণ করা হয়, (দুই) জমিদারদেরকে তথাকথিত ক্ষতিপূরণ (?) (যারা দেড়শ বছর ধরে সাধারণ কৃষক শ্রেণীর রক্ত শোষণ করেছিল তাদেরকে আবার ক্ষতিপূরণ দেয়া কেন? এটা কি শোষণের পুরষ্কারস্বরূপ?) দেয়া হয়, এবং (তিন) ভূমি ব্যবস্হার ক্ষেত্রে নতুন নিয়ম কানুন চালু করা হয়। মধ্যস্বত্ব অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন (১৯৫০-১৯৫১ সালের ২৮ নং আইন), এ মোট ১৫২টি ধারা আছে যার মধ্যে ১ থেকে ৭৮ ধারা জমিদারী তথা মধ্যস্বত্ব অধিগ্রহণ ও ক্ষতিপূরণ সম্পর্কিত ব্যবস্থার বিন্যাস, এবং ৭৯ থেকে ১৫২ ধারা ভূমি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়ের সারাৎসার। ১৯৬৩ সালে এস এ জরিপ সমাপ্ত হওয়ায় ধারণা করা হয় যে ১-৭৮ ধারার কাজ ইতোমধ্যেই সম্পন্ন হয়ে গেছে। তবে ৭৯-১৫২ ধারাসমূহ বর্তমান ভূমি ব্যবস্থাপনার সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলার সমাজ কাঠামোকে যেমন বদলে দিয়েছিল, মধ্যস্বত্ব ও প্রজাস্বত্ব আইনও তেমনিভাবে বাংলার সামাজিক, অর্থনৈতিক ভিতকে পরিবর্তনের দিকে ঠেলে দেয়।

[৭] মিয়া, মোঃ আব্দুল কাদের ঃ ভূমি জরিপ ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, এ. কে. প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা-১১।

এ আইনের মাধ্যমে দেড়শো বছরের পুরানো মধ্যস্বত্ব (বা জমিদারী) অধিগ্রহণ করা হলো এবং রায়তকে মালিক হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে তাকে জমি ভোগদখল ও হস্তান্তরের (উত্তরাধিকারসহ) পূর্ণ অধিকার দেয়া হলো। এ আইনের সবচেয়ে বড় অবদান বা কৃতিত্ব হলো উপর্যুক্ত বিষয় দু'টি। ইংরেজ শাসনের পূর্বে বাংলা-ভারতে জমির মালিকানা স্বীকৃত ছিল যেখানে জমির উত্তরাধিকার নিশ্চিত ছিল; কিন্তু জমিদারী প্রবর্তনের ফলেই এ চিরাচরিত ব্যবস্থা ধ্বংস করা হয়েছিল।

এ আইন মোতাবেক হাট-বাজার, খনিজ সম্পদ, জলমহাল, পাথরমহাল, বালুমহাল, সরকারের নিয়ন্ত্রণে চলে এল। জমি ভাড়া দেয়া নিষিদ্ধ হলো, যদিও বর্গাপ্রথা বহাল রইলো মজুরি শ্রম দিয়ে আবাদ করার অর্থে। পরিবার প্রতি ১০০ বিঘা বা পরিবারের সদস্য প্রতি ১০ বিঘা এর মধ্যে যেটা সর্বোচ্চ হয় সেরূপে জমি রাখার বিধান করা হলো।

এছাড়া বসতবাড়ির জন্য সর্বোচ্চ ১০ বিঘা রাখার বিধান বহাল রেখে বাকি জমি সরকারের মালিকানায় রাখার ব্যবস্থা করা হলো। সরকারে বর্তানো এরূপ জমি ৩ একরের কম জমি ছিল এমন স্থায়ী কৃষকদের মাঝে বন্টন করার বিধান রাখা হলো। এখানে উল্লেখ্য যে, চা, ইক্ষু, রাবার চাষ, কফি, ফলের বাগান, কার্শিয়া পাতার বাগান, যান্ত্রিক আবাদের আওতাধীন বড় খামার ও বৃহদায়তন দুগ্ধ খামার প্রভৃতির ক্ষেত্রে বর্ণিত জমির সিলিং ব্যবস্থা অপ্রযোজ্য রাখা হলো অর্থাৎ শিথিল করা হলো।

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের মালিকানাধীন খাজনা গ্রহীতা এস্টেটগুলো রাষ্ট্রের দখলভুক্ত করার ব্যবস্থা করা হলো। তবে ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য (ওয়াকফুল আওলাদ) ধর্মীয় সম্পত্তির ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৩৭৫ বিঘার সিলিং রেখে সর্বসাধারণের সেবায় (ওয়াকফ্ লিল্লাহ) প্রদত্ত এস্টেটের ক্ষেত্রে কোন বিধি নিষেধ রাখা হলো না।

এ আইনে জমিদারদের ক্ষতিপূরণ দেয়ার ব্যবস্থা রাখা হলো। যাদের জমি থেকে বার্ষিক আয় ৫০০ টাকা বা তার কম ছিল তাদের আয়ের ১০ গুণ এবং যাদের আয় ১ লাখ টাকা বা তার বেশি ছিল তাদের বেলায় দ্বিগুণ হারে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা রাখা হলো। খাজনা নির্ধারণের ক্ষেত্রে জমিতে উৎপাদিত ফসলের এক-দশমাংশ নির্ধারণ করা হলো। সিলেট জেলায় নানকার নামে প্রচলিত ভূমিদাস প্রথা বাতিল করা হলো।

মধ্যস্বত্ব অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের বেশ কিছু ধারা ভূমি প্রশাসনে বর্তমানে ব্যবহৃত হচ্ছে। এর মধ্যে স্বত্বলিপি সংরক্ষণ বা হালনাগাদকরণ (১৪৩ ধারা), স্বত্বলিপি সংশোধন (১৪৪ ধারা), জোত একত্রীকরণ (১১৬ ধারা), জোত বিভক্তিকরণ (১১৭ ধারা), রাজস্ব কার্যক্রমের ওপর আপীল (১৪৭ ধারা), রিভিশন (১৪৯ ধারা) ও রাজস্ব কর্মকর্তা কর্তৃক সম্পাদিত কাজের ওপর রিভিউ (১৫০ ধারা) ইত্যাদি ধারাগুলো অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

উল্লেখ্য, এ আইন তিন পার্বত্য জেলায় প্রযোজ্য নয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দেশে জমিদারী সৃষ্টি করেছিল, পক্ষান্তরে এ আইন তার বিলুপ্তি ডেকে আনে বলে বাংলাদেশের ভূমি আইনের ইতিহাসে মধ্যস্বত্ব অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনটি একটি মাইলফলক হিসেবে অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

মধ্যস্বত্ব অধিগ্রহণ আইন বাস্তবায়ন ও পরবর্তী ফলাফল পর্যালোচনা

বিনা পরিশ্রমে অর্থোপার্জন, সামাজিকভাবে প্রভাব ও ক্ষমতার স্বাদ পাওয়া জমিদার শ্রেণী মধ্যস্বত্ব অধিগ্রহণকে মনেপ্রাণে মেনে নেয়নি। বিশেষ করে তৎকালীন ক্ষমতাসীন শাষকগোষ্ঠী মুসলিম লীগের একাংশের প্রবল অনীহার কারণে এ আইন কার্যকর হতে অনেক সময় লেগে যায়। শুধু অনীহা বললে ভুল হবে, শোষক শ্রেণীর পক্ষ থেকে এ আইন যাতে দ্রুত বাস্তবায়িত না হয় সেজন্যে হাইকোর্টে মামলা দায়ের করা হয়। ১৯৫৭ সালের জানুয়ারি মাসে সরকার পক্ষ হাইকোর্টে ও সুপ্রিম কোর্টে জয়ী হয়ে মধ্যস্বত্ব পাইকারী দখল করার সুযোগ লাভ করে এবং ১৯৫৮ সালের মাঝামাঝি সময়ে মধ্যস্বত্ব অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয়। দেশের ৪৪৩টি বড় জমিদারী দখল করতে ৬ বছর সময় (১৯৫০-৫৬) লেগে যায়।[৮] এখানে উল্লেখ্য যে, মুসলিম লীগ সরকারের মূল পরিকল্পনা ছিল তথাকথিত ‘সংক্ষিপ্ত কার্যক্রম’ সমাপ্ত হলে দ্বিতীয় পর্যায়ে মধ্যস্বত্ব অধিগ্রহণের কাজ ধীরে ধীরে ১৪ বছর ধরে বাস্তবায়ন করা। কিন্তু ইতোমধ্যেই ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট বিজয়ী হওয়ায় ভূমিলোভী সামন্ততান্ত্রিক ক্ষমতা কাঠামোয় পরিবর্তন আসে এবং যুক্তফ্রন্ট সরকার সব মধ্যস্বত্ব স্বার্থকে দখল করতে সিদ্ধান্ত নেয়। যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় না এলে মধ্যস্বত্ব অধিগ্রহণ হয়ত কোন অন্ধকার চোরাগলিতে হারিয়ে যেত।

সামন্ততান্ত্রিক শক্তির রাষ্ট্রাচার মধ্যস্বত্ব বিলোপের পক্ষে পুরোপুরি ছিল না, কেননা বর্গাপ্রথাকে এ আইনের মাধ্যমে বিলুপ্ত করা হয়নি। বর্গাপ্রথা বিলুপ্ত না করার কারণে ভাগচাষীরা নিজস্ব স্বার্থতাড়নায় উদ্বুদ্ধ হতে পারেনি কখনোই, সেজন্যে কৃষির প্রত্যাশিত উৎপাদন অর্জন করা সম্ভব হয়নি। সিদ্দিকীর মতে, ভাগচাষকে মজুরি শ্রমের সংগে এক করে দেখে এ আইন শুধু যে পুনর্ভাড়া এবং খাজনা গ্রহণের মধ্যবর্তী স্বার্থগুলোর ওপর এক নিষেধাজ্ঞা অর্থহীন করে তুলে এমন নয় বরং উৎপাদন বিরোধী একটা পদ্ধতিকে স্থায়ীত্ব দিয়েছে।[৯]

১৯৮৪ সালের ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশ (১৯৮৪ সালের ১০ নং অধ্যাদেশ) এর আগে বর্গাচাষীদের ভাগ্যের উন্নয়নের জন্য কোন আইন প্রণীত হয়নি। ১৭৯৩

---

[৮] সিদ্দিকী, কামাল, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩২।

[৯] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩৩।

সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কারণে সৃষ্ট বহু মধ্যস্বত্বভোগীদের পারস্পরিক সম্পর্ক শোষণমূলক হওয়ার ফলে বর্গাচাষীর ঘাড়ে শোষণের চরম অংকটি পড়ে যা ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশের মাধ্যমে কিঞ্চিৎ লাঘবের চেষ্টা করা হয়। বাংলাদেশে ভূমি সংস্কারের ইতিহাসে মধ্যস্বত্ব অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন ব্যাপক সদিচ্ছা ও ব্যবস্থা নিয়ে আবির্ভূত হলেও সামন্ত মানসিকতার অধিকারী ভূম্যাধিকারীগণের প্রবল অনীহা এবং ক্ষেত্রবিশেষে ব্যাপক বাধার কারণে তা পূর্ণ মাত্রায় সুফল প্রদান করতে ব্যর্থ হয়। মূল আইনে পরিবার প্রতি জমির সিলিং ১০০ বিঘা রাখা হলেও ১৯৬১ সালে (আইয়ুব খানের সামরিক শাসনামলে) তা বাড়িয়ে ৩৭৫ বিঘায় উন্নীত করা এবং অনেককে (যেখানে সম্ভব হয়েছে) সরকারিভাবে দখলকৃত জমি প্রত্যার্পণ করা হয়। দেখা যাচ্ছে মধ্যস্বত্ব অধিগ্রহণের সদিচ্ছা ও সম্ভাবনা এখানে প্রচণ্ডভাবে ধাক্কা খেল।

পাকিস্তানের স্বৈরশাসকগোষ্ঠীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, আন্দোলন ও সবশেষে রক্তক্ষয়ী ৯ মাস মুক্তিযুদ্ধের ফসল স্বাধীন বাংলাদেশের ভূমি সংস্কারের ইতিহাসে ১৯৮৪ সালের ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশ একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এ অধ্যাদেশে জমির সিলিং পূর্বের ১০০ বিঘা থেকে নামিয়ে ৬০ বিঘায় আনা হয়। এ অধ্যাদেশে বর্গাজমির ফসলের অংশ নির্ধারণ করে বলা হয় যে, ভূমির মালিক মালিকানার জন্য পাবে এক-তৃতীয়াংশ, শ্রমদানের জন্য বর্গাদার পাবে এক-তৃতীয়াংশ এবং ফসলের অবশিষ্টাংশ মালিক বা বর্গাদার বা উভয়ের মধ্যে উৎপাদনের উপকরণ সরবরাহের অনুপাতে ভাগ হয়ে যাবে। বৃটিশ আমল থেকে শুরু করে এ অধ্যাদেশের পূর্ব পর্যন্ত বর্গাচাষী ও মালিকের মধ্যে ফসল বন্টন সংক্রান্ত কোন আইন প্রণীত হয়নি। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে মালিক ও বর্গাচাষীদের মধ্যে বিরাজিত দীর্ঘদিনের সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। তবে এটা ঠিক যে, এ ব্যবস্থার মাধ্যমে ভূমিতে আধা-সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেয়া হলো এবং বর্গাপ্রথা বিলুপ্ত না করে তাকে রাষ্ট্রীয়ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করা হলো। এর ফলে কৃষি কাঠামোতে সমবায় খামারভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা চালুর যে পটভূমি ঐতিহাসিকভাবে সৃষ্টি হয়েছিল তা অপসৃত হয়ে যায় এবং এর দ্বারা পূর্বের কম উৎপাদন প্রবণতার কারণসমূহ উৎপাদন পদ্ধতির মধ্যে অঙ্গাঙ্গিভাবে বিজড়িত হয়ে উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হিসেবে দাঁড়িয়ে যায়। অদ্যাবধি উপর্যুক্ত ব্যবস্থাই বহাল আছে যাকে অন্য কোনভাবে রূপান্তরের ভাবনা রাজনৈতিক শক্তি এখনো পর্যন্ত দেখাতে ব্যর্থ হচ্ছে।

বাংলাদেশের উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তনের জন্য মধ্যস্বত্ব অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনে কিছু ব্যবস্থা সহায়ক হিসেবে ছিল, যেমন বৃহদাকারের খামারে চাষাবাদ। কিন্তু বৃহদাকারের খামারে চাষাবাদের প্রতি সামন্ততান্ত্রিক মানসিকতার কারণে আগ্রহ তৈরি হয়নি; যা হয়েছে তাহলো যান্ত্রিক পদ্ধতির সীমিত আকারে চাষাবাদে সার

কীটনাশক প্রয়োগ। সমবায় খামার ভিত্তিক চাষাবাদের ব্যবস্থা মধ্যস্বত্ব আইনে ছিল না, আর থাকলেও তা বাস্তবায়িত হতো না, কারণ ভূমিতে বিদ্যমান কর্তৃত্বশীল গোষ্ঠী সমবায় খামার ব্যবস্থার আদর্শে আগেভাগে কোনরূপ উদ্বুদ্ধ ছিল না। তবে বৃহদাকার চাষাবাদের ব্যাপক প্রচলন করা সম্ভব হলে সমবায় খামার ভিত্তিক চাষাবাদ ব্যবস্থার প্রতি কৃষক সমাজকে উদ্বুদ্ধ করা যেত।

স্বাধীনতা উত্তর কৃষির উৎপাদনের ক্ষেত্রে সার, কীটনাশক ও ট্রাকটরের ব্যবহার যথেষ্ট বেড়ে যায়; কিন্তু হাড় বেরিয়ে যাওয়া গবাদি পশুর দ্বারা বাহিত আদিম কাঠের লাঙ্গলের ব্যবহারে কোন তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন আসেনি। জমির বিচ্ছিন্নকরণ, খন্ডিকরণ, বৃহৎ পরিবারে ভাঙ্গন ও অণু পরিবার গঠিত হওয়ার ফলে মাঠেমাঠে জমি শতধা বিভক্ত হয়ে পড়ে যা ট্রাকটর দ্বারা চাষাবাদের অনুপযোগী হয়ে যায়। তবে পাওয়ার টিলার তার জায়গা অনেক ক্ষেত্রে দখল করলেও হালের বলদের প্রতিস্থাপন তার দ্বারা সম্ভব হয়নি। পাওয়ার টিলার ব্যক্তিগত পর্যায়ে ব্যবহারের পাশাপাশি কোথাও কোথাও অন্যের জমি ভাড়ার ভিত্তিতে চাষাবাদে ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রান্তিক চাষী, নিম্নবিত্ত কৃষক, মধ্যবিত্ত কৃষক শ্রেণীর পক্ষে ট্রাকটর বা পাওয়ার টিলার ব্যবহার করা ব্যয়বহুল হয়ে যাওয়ায় তা তাদের আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে; শুধু ধনী কৃষক শ্রেণী কৃষির আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের সুযোগ পাচ্ছে।

বাংলাদেশের সমাজ কাঠামোর পরিবর্তনে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু তা সামন্ততান্ত্রিক ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের চরিত্রকে মজবুত করেছিল এবং অনেক ধরনের ভূমিস্বত্বের বা মধ্যস্বত্বের সৃষ্টি করেছিল যা ১৯৫০ সালের মধ্যস্বত্ব অধিগ্রহণের ফলে পুরোপুরি তিরোহিত না হয়ে আধা-সামন্ততান্ত্রিক সামাজিক বৈশিষ্ট্যকে জিইয়ে রাখে।

উপসংহার

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বণিকের মানদন্ড রাজদন্ডে রূপান্তর পরবর্তী বাংলা-ভারতে বৃটিশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের ফলে ভূমি মালিকানায় ব্যাপক পরিবর্তনসহ অসংখ্য শোষকশ্রেণী তথা মধ্যস্বত্বভোগী (যারা মূলত অলস, অকর্মা: খাজনা আদায় ছাড়া যাদের উৎপাদন বৃদ্ধিতে কোন ভূমিকা নেই) শ্রেণীর উদ্ভব হয় এবং সমাজে এক পরগাছা শ্রেণীর বৈদেশিক সামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতির জন্ম হয়। মধ্যস্বত্ব শ্রেণীর সৃষ্ট অনাচার নিরোধে পরবর্তীকালে প্রতিকার ব্যবস্থা হিসেবে বৃটিশ আমলের শেষের দিকে গঠিত ফ্লাউড কমিশনের সুপারিশের আলোকে পকিস্তান আমলে ১৯৫০ সালে মধ্যস্বত্ব অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন পাশ হলেও বাস্তবায়ন পর্যায়ে দেখা গেল যে, যে সদিচ্ছা নিয়ে এ আইনের জন্ম হয়েছিল সামন্ত মানসিকতা সম্পন্ন রাজনৈতিক

(ক্ষমতাসীন ও ক্ষমতাবহির্ভূতসহ) শক্তি সে সদিচ্ছাকে বহুলাংশে গলা টিপে হত্যা করে। জমির সিলিং প্রথমে ১০০ বিঘা কমিয়ে আনার প্রস্তাব করলেও এবং তা অনেকাংশে বাস্তবায়ন করলেও ১৯৬১ সালে তা বাড়িয়ে ৩৭৫ বিঘায় পুনঃনির্ধারণ করায় সরকারিভাবে ইতোপূর্বে দখলীকৃত জমি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের পুনরায় ফিরিয়ে দেয়া হয়। ১৯৭২ সালে এক অধ্যাদেশ (প্রেসিডেন্টের আদেশ নং-৯৮, ১৯৭২) বলে আবাদী জমির সর্বোচ্চ সীমা ১০০ বিঘায় নামিয়ে আনা হয় এবং ১৯৮৪ সালের (১৯৮৪ সালের ১০ নং অধ্যাদেশ) ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশে পূর্বোক্ত ১০০ বিঘার স্থলে পরিবার বা ব্যক্তির জমি অর্জনের সর্বোচ্চ সীমা ৬০ বিঘায় নামিয়ে আনা হয়। এ অধ্যাদেশে দীর্ঘদিনের পুঞ্জিভূত বর্গাপ্রথা সমস্যার কিছুটা সমাধান করা হয় ফসলের ভাগাভাগি নিরূপণের মাধ্যমে। তবে বর্গাপ্রথা, (যে সামন্ততান্ত্রিক ভূমি ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ধারণ করে আছে তাকে সমর্থন দেয়ার কারণে) বাংলাদেশের ভূমি সংস্কারের ইতিহাসে আমূল (র‍্যাডিক্যাল) ধারায় পরিবর্তন আনতে ব্যর্থ হয়, অর্থাৎ উৎপাদন ব্যবস্থায় ভূমি মালিক ও বর্গাদারের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি সামন্ততান্ত্রিক সামাজিক সম্পর্ককে পাকাপোক্ত করে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশে দারিদ্র্যের ব্যাপক বিস্তার ঘটেছে, যার একটি বৈশিষ্ট্য হিসেবে বলা যায় ক্রমবর্ধমান ভূমিহীনতা রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মধ্যস্বত্ব অধিগ্রহণ ব্যবস্থাপত্রে বৃহদাকার খামারে উৎপাদনের প্রস্তাবনা থাকলেও সমবায় খামার ভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা গুরুত্বহীন হয়ে পড়ায় এবং কৃষির আধুনিকীকরণের পর্যায়ে কীটনাশক, সার, গভীর নলকূপ, ট্রাকটর, পাওয়ার টিলার ব্যবহারের সুযোগ উচ্চবিত্ত কৃষক শ্রেণী তুলনামূলকভাবে বেশি লাভ করার কারণে নিম্নবিত্ত ও প্রান্তিক চাষীদের নাভিশ্বাস উঠেছে। অপরদিকে উচ্চবিত্ত কৃষক শ্রেণী কর্তৃক প্রান্তিক চাষীদের উৎপাদন ও শ্রম শোষণের কারণে কৃষির উৎপাদন ব্যবস্থায় আধা-পুঁজিবাদী বিশিষ্টতা বিকাশমান পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। উপর্যুক্ত আলোচনায় এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, মধ্যস্বত্ব বিলুপ্ত হলেও সামগ্রিক বিচারে এখনো সামাজিক সম্পর্ক অসম আর্থিক কাঠামোয় বিন্যস্ত আছে যা সুচিন্তিতভাবে পরিমার্জন ও পরিবর্তনের অপেক্ষায় রয়েছে।

উপর্যুক্ত আলোচনায় একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, যেমনটি ওয়ালারস্টাইনের মতে ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার বিকাশে রাষ্ট্রের ভূমিকাই মুখ্য, বাংলাদেশে ভূমি সংস্কারের পথে বিদ্যমান ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক শক্তি ও সরকার সব সময় রক্ষণশীল ভূমিকা পালন করেছে এবং সে কারণে দেশের সমাজ পরিবর্তন না ধনতান্ত্রিক পথে না সামন্ততান্ত্রিক পথে অগ্রসর হয়েছে। তবে সে নিশ্চলতা ও অপরিবর্তনীয়তায় রাষ্ট্রের ভূমিকাই যে মুখ্য হয়ে দেখা দিয়েছে তার সুস্পষ্ট সমর্থন মেলে।

তথ্য নির্দেশিকা

১। উমর, বদরুদ্দীন : বাংলাদেশের কৃষক ও কৃষক আন্দোলন, প্রগতি প্রকাশনী, ঢাকা, সেপ্টেম্বর ১৯৮৫।

২। উমর, বদরুদ্দীন : চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাংলাদেশের কৃষক, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ভাদ্র ১৩৮১।

৩। ভূইয়া, গোলাম কিবরিয়া : বাংলার মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন ১৯৯৫।

৪। মিয়া, মোঃ আব্দুল কাদের : ভূমি জরিপ ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, এ, কে প্রকাশনী, ঢাকা, নভেম্বর ১৯৯৫।

৫। রহমান, আসহাবুর : বাংলাদেশের কৃষি কাঠামো কৃষক সমাজ ও উন্নয়ন, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, জুলাই ১৯৮৬।

৬। সিদ্দিকী, কামাল : বাংলাদেশে ভূমি সংস্কারের রাজনৈতিক অর্থনীতি, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা সংস্থা, ঢাকা, আগস্ট ১৯৮১।

৭। সিদ্দিকী, কামাল : বাংলাদেশের গ্রামীণ দারিদ্র স্বরূপ ও সমাধান, ডানা প্রকাশনী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫।

৮। হক, কাজী এবাদুল : ভূমি আইন ও ভূমি ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০২।

৯। Alamgir, Muhiuddin Khan (Edited by) : Land Reform in Bangladesh, Centre for Social Studies, Dhaka, September 1981.

১০। Choudhury, Lutful Haq : Social Change and Development Administration in South Asia, National Institute

			of Public Administration, Dhaka 1978.
১১।	Chowdhury, Anwarullah	:	Agrarian Social Relations & Development in Bangladesh, Oxford & IBH Publishing Co., New Delhi, 1982.
১২।	Eashvaraiah, P.	:	Political Dimension of Land Reforms in India, Ashish Publishing House, New Delhi, 1985.
১৩।	Hossain, A M Mozammel	:	Rural Development at the Cross Roads in Bangladesh. Prottasha Prokashan, Dhaka, February 1993.
১৪।	Jahangir, B.K.	:	Rural Society, Power Structure and Class Practice, Centre for Social Studies, Dhaka, 1982.
১৫।	Khan, I Shamsul	:	Political Culture, Political Parties and the Democratic
	Islam, S. Aminul		Transition in Bangladesh, Academic Publishers, Dhaka
	Haque, M. Imdadul		1996.
১৬।	Nisbet, Robert A	:	Social Change & History, Oxford University Press, New York, 1969.
১৭।	Pandey, Dr. M.P.	:	Land Records and Agrarian Situation in Bihar, Naya Prokash, Calcutta, April 1980.
১৮।	Sen, Rangalal	:	Political Elites in Bangladesh, The University Press Limited, Dhaka, April 1986.
১৯।	Sharma, Rajendra. K	:	Social Change & Social Control, Atlantic Publishers & Distributors, New Delhi, 1997.
২০।	Siddiqui, Kamal	:	Land Reforms and Land
	Hossain, Imam		Management in Bangladesh

	Islam, Zahirul Chowdhury, Nazmul Islam, Momen Abul		and West Bengal, The University Press Limited, Dhaka, 1988.
২১।	Zollschan, George K Hirsch, Walter (edited)	:	Social Change : Explorations, Diagnoses & Conjectures, Schenkman Publishing Company, New York 1976.

১ বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা,
সপ্তম বর্ষ সংখ্যা কার্তিক ১৪০৯

বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যঃ একটি আলোচনা

আনিসুর রহমান খান*

Cultural Heritage of Bangladesh : A Discussion

Anisur Rahman Khan

Abstract: Sociologically speaking, culture is the way of life and a nation's/society's identity as revealed by it. Bangladesh is said to be the land of composite-culture, and it is embedded in rich cultural heritage. Despite different sects and creeds, the cultural heritage of Bangladesh is engrained in the glamorous exposition of this nation from time immemorial. Without proper preservation and understanding of different elements of cultural heritage- we can not embark on the path to enlightenment. But what is important is that, how much we really understand and feel synthesize towards the elements in search of separate entity as a nation. The aim of this article is to shed light on our origin, evolution, adaptation and above all, to establish a sound platform for our everlasting identity.

ভূমিকা

কোন দেশ বা জাতির পরিচয় ঐ দেশ বা জাতির সাংস্কৃতিক অবয়বের মধ্যে নিহিত। সৃষ্টির শুরু হতে বিভিন্ন প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে অগ্রসরের মাধ্যমে কোন দেশ বা জাতি একসময় নিজস্বতা বা স্বকীয়তা অর্জন করে-আর এটাই প্রকৃতির নিয়ম। এই নিজস্বতা বা স্বকীয়তার প্রকাশ অন্যকথায় তার সাংস্কৃতিক বহিঃপ্রকাশও বটে । এরই ধারাবাহিকতায় আমরা যদি বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক পরিচয় বা আরেকধাপ এগিয়ে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে জানতে চাই, তবে আমাদের সংস্কৃতি প্রত্যয়টি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। শুরুতেই বলে নেয়া প্রয়োজন, যে সংস্কৃতি হচ্ছে এমন একটি প্রত্যয়, যার আলোচনা বহুবিভাজনে বিভক্ত। কেননা কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক, ঐতিহাসিক, নৃবিজ্ঞানী এবং সমাজবিজ্ঞানীরা তাদের নিজস্ব দৃষ্টিকোন থেকে সংস্কৃতিকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। যেমন, ঐতিহাসিকরা সংস্কৃতি বলতে এক একটি ঐতিহাসিক পর্বের কৃষ্টি, প্রথা, রীতি-নীতি বা রেওয়াজকে বুঝে থাকেন। সাহিত্যে সংস্কৃতি বলতে মনোজগতের ভাবনা, কল্পনা, ধ্যান-ধারণা ইত্যাদি বুঝায়। আর আমরা বেশীরভাগই সংস্কৃতি বলতে গান, চিত্রকলা, নাট্যকলা, শিল্পকলাসহ নানাবিধ

* সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।

সাহিত্য কর্মকে বুঝে থাকি। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন, এসবই সংস্কৃতির অন্যতম উপাদান কিন্তু কোন পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ নয়। বরং নৃবিজ্ঞান বা সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে সংস্কৃতির ব্যাখ্যা অনেক বেশী বাস্তবসম্মতঃ এবং সর্বউপাদান আবৃত্তকারী। কেননা নৃবিজ্ঞান বা সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষের সামগ্রিক জীবনধারাকে বা সমস্ত সৃষ্টি আর কর্মকে সংস্কৃতি নামে আখ্যায়িত করা হয়। এ সম্পর্কে বলা যায়, কোন জাতি বা গোষ্ঠীর দৈনন্দিন নিত্যপ্রয়োজনীয় কর্ম থেকে শুরু করে তার চিন্তাধারার বহিঃপ্রকাশের সম্মিলিত রূপায়ন এবং সেই সাথে সমাজের সদস্য হিসেবে অর্জিত আচরণবিধিই সংস্কৃতি। আরও সহজে বলতে গেলে শয়নে, বসনে, আহারে, বিহারে অধিকাংশ লোক স্বতঃস্ফূর্তভাবে যার অনুশীলন করে সেটাকেই সংস্কৃতি বলা উচিত। এ সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকাইভারের উক্তিটি প্রণিধান যোগ্য, তিনি বলেন,

> "It (culture) is the expression of our nature, in our modes of thinking, in our everyday intercourse, in art, in literature, in religion, in recreation and enjoyment." MacIver and Page, Society: 499

বর্তমানে সমাজবিজ্ঞানী ও নৃবিজ্ঞানীরা সংস্কৃতির ব্যাখ্যায় 'সাংস্কৃতিক আপেক্ষিকতা' বা Cultural Relativity প্রত্যয়টি ব্যবহার করেন। এর অর্থ হল কোন একটি নিদিষ্ট সংস্কৃতিকে অন্য সংস্কৃতির সাথে তুলনায় উচ্চ বা নীচু মানে বিচার করা যায় না। প্রত্যেকটি সংস্কৃতিই তার নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে আলাদা এবং অনন্য সাধারণ সকল সমাজেই সংস্কৃতি থাকে এবং আছে। সমাজভেদে সংস্কৃতি শুধু উন্নত, পরিণত বা অপরিণত বা অনুন্নত হতে পারে। সমাজের নিজস্ব কর্ম, বিশ্বাস ও মূল্যবোধের উপর সংস্কৃতি প্রভাব বিস্তার করে। এ বিশ্বাস, কর্ম বা মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে সমাজভেদে সংস্কৃতির ভিন্নময়তা পরিলক্ষিত হয়। যেমন, আফ্রিকার কোন কোন অঞ্চলে মোটা মেয়ে সবচেয়ে বেশী সুন্দরী বলে বিবেচিত। বিয়ের আগে মেয়েদের প্রচুর পরিমাণে খাওয়ানো হয় যাতে সে আরও মোটা হয়। সুন্দরের এ ধারণা আমাদের প্রচলিত ধারণা হতে সম্পূর্ণ আলাদা। অর্থাৎ, প্রত্যেক সমাজেই তার সংস্কৃতির একটি নির্দিষ্ট ধারবাহিকতা ও নিজস্বতা রয়েছে। ফলশ্রুতিতে সংস্কৃতির একটি স্বতন্ত্র ইতিহাস বা ঐতিহ্য রয়েছে। বর্তমান আলোচনায় আমরা বাংলাদেশের সংস্কৃতির এই নিজস্ব ধারাবহিকতা বা ঐতিহ্য অনুসন্ধানের চেষ্টা করব।

সংস্কৃতির প্রকারভেদ

এই যে দৈনন্দিন কাজকর্ম বা চিন্তাধারার বহিঃপ্রকাশের সম্মিলনে যে সংস্কৃতি তাকে সমাজবিজ্ঞানী এবং নৃবিজ্ঞানীরা প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করেন; (ক) বস্তুগত (Material) বা বাহ্যিক (Explicit) সংস্কৃতি এবং (খ) অবস্তুগত (Immaterial) বা অ-বাহ্যিক (Implicit) সংস্কৃতি। ঘরবাড়ির ধরন, পোষাক পরিচ্ছদের ধরন,

তৈজসপত্র, আসবাবপত্র, উৎপাদন উপকরণ ইত্যাদি হল বস্তুগত সংস্কৃতি। আর দক্ষতা, জ্ঞান, আচার-বিশ্বাস, ধ্যানধারণা, ভাষা, সংগীত, সাহিত্য, নৃত্য, শিল্পকলা ইত্যাদি নানাবিধ উপাদান নিয়ে গড়ে উঠে অবস্তুগত সংস্কৃতি -যাকে নন্দনগত এবং ভাবগত উপাদানের সংমিশ্রণও বলা যায়। এক কথায় বস্তুগত এবং অবস্তুগত সংস্কৃতির সম্মিলনেই পূর্ণাঙ্গ সাংস্কৃতিক পরিচয়। কোন সমাজের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের আলোচনা শুধুমাত্র বস্তুগত বা অবস্তুগত সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করে হতে পারে না, বরং এ দুয়ের সমন্বয়েই হবে পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ।

সংস্কৃতি ও সভ্যতা

এখানে সংস্কৃতির সঙ্গে সভ্যতার সম্পর্কটা কি এ সম্পর্কে দুই একটি কথা বলে নেয়া প্রয়োজন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন আবিষ্কারের ফলে এবং তার সাথে ব্যাক্তির সৃজনশীল প্রয়াস দ্বারা সমাজ যে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে - অর্থাৎ যাকে আমরা সভ্যতা বলে অভিহিত করছি, তার সঙ্গে সংস্কৃতিকে কিভাবে ব্যাখ্যা করব? যদিও সমাজবিজ্ঞানে এ দুটি প্রত্যয়ের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা রয়েছে, কিন্তু উভয়ের সম্পর্ক নিবিড়, ক্ষেত্রবিশেষে একটি অন্যটির উপর নির্ভরশীল। আমরা সংস্কৃতি বিভাজনে বস্তুগত ও অবস্তুগত সংস্কৃতির কথা বললাম, আর সমাজবিজ্ঞানের ভাষায় বস্তুগত সংস্কৃতির উন্নততর রূপায়নই সভ্যতা এবং বস্তুগত সংস্কৃতির এই উপাদানগুলোর মধ্যে অবশ্যই নিজস্বতা থাকতে হবে। কিন্তু সভ্যতার ক্ষেত্রে নিজস্বতার পাশাপাশি বাইরের সমাজের প্রভাবও থাকতে পারে; যেমন, এদেশের ঐতিহ্যিক বস্তুগত সংস্কৃতির একটি বাহন হল নৌকা, কিন্তু নৌকায় গতিময়তা আনার জন্য ইঞ্জিন ব্যবহৃত হচ্ছে। এক্ষেত্রে ইঞ্জিনই সভ্যতার প্রতীক। আবার বলা যায়, আগ্রার তাজমহল সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন নামকরা আধুনিক ভবনের চেয়ে মূল্যবান, কেননা তাজমহল সৃষ্টির পিছনে আবেগ আর ভালবাসার প্রকাশ পেয়েছে, কিন্তু ঐসব ভবনসমূহ সভ্যতার ফসল হলেও তাজমহলের মত ঐতিহ্যবাহী নিদর্শন হয়ত নয়। যাহোক, সভ্যতা ও সংস্কৃতি এ দুইটি অবশ্যই আলাদা সামাজিক প্রপঞ্চ। মানবজীবনের বিশ্বাস ও মূল্যবোধ দ্বারা সংস্কৃতি প্রভাবিত, এর সাথে সমাজজীবনের সম্পর্ক একেবারে শিকড়ে গ্রথিত। কিন্তু সভ্যতার ক্ষেত্রে তা নয়, এ খুব সহজে আয়ত্তযোগ্য এবং পরিমাপযোগ্য। তাইত দেখা যায়, বিভিন্ন দেশে অভিন্ন সভ্যতা বিরাজ করলেও জীবনধারাগত পার্থক্য রয়েছে। যেমন, ফরাসীদের খাওয়া-দাওয়া ও চিন্তাধারার সাথে ইংরেজ জাতির যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে, কিন্তু এদেশ দুটোর সভ্যতার বিভিন্ন নিদর্শন প্রায় অভিন্ন। সমাজ বিজ্ঞানীদের মতে সভ্যতা তাই যতই বস্তুগত সংস্কৃতির এক উন্নততর পর্যায় হোক না কেন, তার সাথে একটি ঐতিহ্যগত; একটি নিজস্ব সৃষ্টিশীলতার সন্ধান থাকতেই হবে। নইলে তা শুধুই সভ্যতা, এর সাথে সংস্কৃতির যোগসূত্রতার সন্ধান নির্ণয় অসম্ভব।

বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উৎসের সন্ধান

মানুষের কর্মময় জীবনই সংস্কৃতি। কর্মের মধ্য দিয়ে মানুষ যে ঐতিহ্য তৈরি করে তা তার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য একটি জাতির পরম সম্পদ। যে জাতি তার ঐতিহ্য লালনে আন্তরিক নয় সে জাতি তার সংস্কৃতিকে ধরে রাখতে পারে না। একটি জাতি বা দেশের যাত্রাপথে তার ইতিহাস, ঐতিহ্য বা উত্তারাধিকার সম্পর্কিত চেতনা তাকে সজীব রাখে। বিশেষ করে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বা উত্তরাধিকার বহতা নদীর মত - তার স্রোতধারার উৎস মূলসম্পদে, পরবর্তীতে বিভিন্ন রূপময়তায় বিকশিত হয়ে প্রবাহিত হয়।

এই যে প্রবাহ তা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রত্যয়ের মাধ্যমে ঘটে; যেমন, সাংস্কৃতিক ব্যাপ্তি (Cultural diffusion), যেখানে পারস্পরিক সম্পর্কের মাধ্যমে বিভিন্ন সমাজের মধ্যে সাংস্কৃতিক লেনদেন বা যোগাযোগ স্থাপিত হয়। ফলে সংস্কৃতি এক সমাজ হতে অন্য সমাজে ব্যাপ্তি লাভ করে। আর সমাজ হতে সমাজে সাংস্কৃতিক ব্যাপ্তি বা প্রসার ঘটার সাথে সাথে একটি বিশেষ প্রক্রিয়ার সৃষ্টি হয় যার নাম সাংস্কৃতায়ন (Acculturation), যার মাধ্যমে বিভিন্ন পরিবর্তন বা পরিবর্ধন প্রক্রিয়ায় এক সমাজের সংস্কৃতি অন্য সমাজে গৃহীত হয়। এছাড়া সংস্কৃতি তার চলার পথে ধার (Borrowing) বা নবউদ্ভাদন (Innovation) প্রক্রিয়ার মাধ্যমেও অগ্রসর হয়। সংস্কৃতি বিশ্লেষণে এগুলো হচ্ছে অপরিহার্য বাস্তবতা।

কোন জাতির বা সমাজের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উৎসের সন্ধান করতে গেলে মনে রাখতে হবে সংস্কৃতি প্রাচীনকাল হতে একক কোন প্রবৃত্তিকে বহন করে প্রকাশিত নয়। 'দেব-নেব-রক্ষা করবো' সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এটি মূল্যবান কথা। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়ায় সংস্কৃতির উপাদানগুলো বারবার পরিবর্তিত বা পরিমার্জিত হয়ে একটা অঞ্চলভিত্তিক, গোষ্ঠীগত বা জাতিগত সাংস্কৃতিকরূপ পরিগ্রহ করে - যা এক সময় বিভিন্ন পর্যালোচনার মাধ্যমে আমরা আবিষ্কার করি। এ ক্ষেত্রে বলা যায় কোন সংস্কৃতি বহির্জগত থেকে ধারণা সংগ্রহ করতে পারে, কিন্তু তার উদ্ভব এবং বিকাশ সম্ভব আপন পরিমন্ডলে। এভাবে সংস্কৃতিক ইতিহাস পর্যালোচনার মাধ্যমেই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সন্ধান সম্ভব। এ প্রসঙ্গে আরও সহজে বা সংক্ষেপে বলা যায়, সংস্কৃতি যদি পূর্ণাঙ্গ জীবনধারা (way of life) হয়, তবে এই জীবধারার যে উপাদানসমূহ যুগ পরিক্রমায় ঐ জাতি, দেশ বা সমাজের মধ্যে একাত্ম হয়ে আছে এবং যা লালন, সংরক্ষণ বা প্রতিপালনের প্রতি ঐ জাতি বা দেশ সচেষ্ট, আর সর্বোপরি যে জীবনধারার পরিচয়ে সামগ্রিক পরিচয় - তাইতো সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। অর্থাৎ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য মূলত এক ঐতিহাসিক দর্পণ। এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত বিশ্লেষণটি উল্লেখযোগ্য, যার মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়ে উঠে সংস্কৃতি এবং এর ঐতিহ্যগত যোগসূত্রতা, "Culture is a set of guidelines(both explicit and

implicit) which individuals inherit as members of a particular society, and which tells them how to *view* the world, how to experience it *emotionally*, and how to *behave* in it in relation to other people, to supernatural forces or gods, and to the natural environment. It also provides them with a way of transmitting these guidelines to the new generation- by the use of symbols, language, art and ritual. To some extent, culture can be seen as an inherited 'lens', through which individuals percieve and understand the world that they inhabit, and learn how to live within it." (Helman, Health, Culture and Illness : 2-3)

বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক জীবনের পরিচয়ে এই সমাজ, দেশ বা জাতির পরিচয় জানাটা অপরিহার্য জরুরী, কেননা সংস্কৃতি জন-মানুষ বা ভৌগলিক পরিমন্ডলের মধ্যে বিকশিত হয়। এ প্রসঙ্গে বলা চলে এ.কটি কৌমগোষ্টীর নাম হিসাবে 'বঙ্গ' পরিচয় লাভ করে। 'বঙ্গ,' 'গৌড়,' 'পুন্ড্র' ও 'রাঢ়'-এই চারটি কৌম নিয়ে বাংলার জনপথ গঠিত। বর্তমানে বাংলাদেশ বা পূর্ববঙ্গই যে, বঙ্গ কৌমের মূল আবাসভূমি এ ক্ষেত্রে পন্ডিতরা একমত। এদেশে যাদর আদিবাস ছিল তারা প্রাক দ্রাবিড় গোষ্ঠীর লোক, যারা অষ্ট্রিক ভাষাভাষী নামে পরিচিত। পরবর্তীতে দ্রাবিড় ভাষাভাষী, আর্য, মঙ্গোলীয়, ইত্যাদি নানাবর্ণের আগমনের ফলে বর্তমানে শংকর জনগোষ্ঠী নামেই এদেশবাসীর পরিচয়। জাতিগত পরিচয়ের মত শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সংস্কৃতির উপাদানগুলো বিচিত্র পালাবদলের মাধ্যমে এগিয়ে গড়ে উঠেছে এমন সংস্কৃতি- যাকে বলা চলে শংকর জনগোষ্ঠীর শংকর সংস্কৃতি।

বর্তমানে তাই বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক পরিচয় composite-culture বা বিভিন্ন সংস্কৃতির সমন্বয়রূপে। কেননা এদেশকে বাঙ্গালী অধ্যুষিত মনে হলেও, এখানে আছে বিভিন্ন উপজাতি, নৃগোষ্ঠীর সমন্বয়ে গঠিত এক বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল। ধর্মীয় দৃষ্টিকোন থেকে তেমনি আছে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খৃষ্টান ধর্মের অনুসারীদের দ্বারা সৃজন বিভিন্নমুখী সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি। সীমিত পরিসরে হলেও আছে অঞ্চলভিত্তিক সাংস্কৃতিক বাস্তবতা। এর আলোকে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বিচার করে বলা যায় এদেশে বিভিন্ন জাতি, বর্ণ নির্বিশেষে সকল সম্প্রদয়ের মধ্যে হাজার বছরের সহঅবস্থান রয়েছে। যদিও ৮ম-৯ম শতক হতে ধীরে ধীরে মুসলমানদের আগমনের ফলে ইসলাম সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু হয়েছিল; কিন্তু মূলকথা হল, ইসলাম এদেশে স্থানীয়ভাবে অভিযোজিত হয়েছে । ফলশ্রুতিতে, এই অভিযোজন প্রক্রিয়ার পাশাপাশি বাদ পড়েনি হাজার বছরের সামাজিক ঐতিহ্য, মূল্যবোধ ও চেতনা। অর্থাৎ নানা উৎসের দানে এবং প্রভাবে বাংলাদেশের সংস্কৃতি নানাভাবে প্রভাবিত হবার পাশাপাশি বিভিন্ন বৈচিত্রতার মধ্যেও এদেশের সংস্কৃতি

একটি সর্বজনীনরূপ পরিগ্রহ করেছে-যা আবহমান বাংলার সংস্কৃতি নামে পরিচিত। বাংলাদেশে বসবাসকারী সকল জাতিগোষ্ঠী এবং সম্প্রদায় কেউ পুরোপরি বা কেউ সীমিত পরিসরে হলেও এই সর্বজনীন সংস্কৃতির ধারক এবং বাহক। বাংলাদেশে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের আলোচনায় এই সর্বজনীন সংস্কৃতির রূপটিই তুলে ধরার চেষ্টা করা উচিত।

এই পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকটি মৌলিক বিষয়ের আলোচনা খুবই জরুরী বলে মনে হয়;

প্রথমতঃ বাংলাদেশের মূল বা সর্বজনীন সংস্কৃতির স্রোতের সঙ্গে উপজাতীয় গোষ্ঠীর সমন্বয় কতখানি, এবং তাদের সংস্কৃতিকে কিভাবে ব্যাখ্যা করা হবে?

দ্বিতীয়তঃ মূল সংস্কৃতির সঙ্গে লোক সংস্কৃতির সম্পর্ক কি, এবং তা কিভাবে বিশ্লেষণ করা হবে?

তৃতীয়তঃ নগর সংস্কৃতি বলতে যা বোঝায় তার সংগে এই সর্বজনীন মূল সংস্কৃতির একাত্নতা কোথায়?

প্রথম প্রশ্নের মীমাংসায় বলা যায় বাংলাদেশের বিভিন্ন উপজাতীয় গোষ্ঠীর সংগে সাধারণ বাঙ্গালী সমাজের মূল পার্থক্য সাংস্কৃতিক স্বতন্ত্রতায়। কারণ প্রতিটি উপজাতির একটি নিজস্ব জীবনধারা বা সাংস্কৃতিক পরিচয় রয়েছে - উপজাতি সমাজের ভাষা, ধর্ম, পরিবার ব্যবস্থা, সামাজিক জীবন সম্পূর্ণ আলাদা। কিন্তু শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে একই মাটিতে সহাবস্থানের মাধ্যমে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়ায় উপজাতীয় সমাজের মধ্যে মূল সংস্কৃতির যে উপাদান প্রবেশ করে নি একথা নিশ্চিত করে বলা যাবে না। এটা এক প্রকার সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়ার ফল। তবে বর্তমান আলোচনা বিভিন্ন উপজাতি সংস্কৃতির পরিব্যাপ্তির বাইরে থাকবে, যেহেতু এসব আলোচনা বিস্তারিত বিশ্লেষণ ও অনুসন্ধানের দাবী রাখে।

দ্বিতীয় প্রশ্নটি খুবই মৌলিক। যুগ যুগ ধরে নিরক্ষর জনসমাজের মধ্যে প্রচলিত বিভিন্ন উপাদানের সমন্বয়ে যে সংস্কৃতি তাকেই লোক সংস্কৃতি নামে আখ্যা দেয়া হয়। আর বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ লোক সংস্কৃতির ভান্ডার, তাই বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং লোক ঐতিহ্য অভিন্ন কিছু নয়, বরং একটি অন্যটির সম্পূরক বা পরিপূরক। সুতরাং বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের আলোচনায় লোক সংস্কৃতির উপাদানগুলো ঘুরে ফিরে আসবে এটাই স্বাভাবিক। আর বেশীরভাগ ক্ষেত্রে লোক সংস্কৃতির উপাদান দ্বারাই পরিবর্তিত ও বিকশিত বাংলার সংস্কৃতি।

আর সবশেষে নগর সংস্কৃতির আলোচনায় সোজা কথায় বলা যেতে পারে, কলকাতা ব্যাতীত সাধারণভাবে বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলে এবং বিশেষভাবে আজকের বাংলাদেশে তার প্রভাব উল্লেখ করার মত কিছু ছিল না। কিন্তু এ কথা বলা ঠিক

যে, আমরা এখনও প্রায় ঐ অবস্থাতেই আছি। অর্থাৎ আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের আলোচনায় নগর সংস্কৃতির তেমন কোন উল্লেখযোগ্য প্রভাব নেই। কেননা যে দেশের ৮৫ ভাগ লোক পল্লীতে বসবাস করে, সেদেশের সংস্কৃতির পরিচয় অবশ্যই পল্লী জীবন কেন্দ্রিক। নগর সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এদেশের সাংস্কৃতিক রূপান্তরটা ছিল এরূপ 'নিজের যা ভাল তা রেখে দাও, অপরের যা ভাল তা গ্রহণ কর।' তাইত ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ করেও বাংগালী ধূতি, চাদর, পাঞ্জাবী ছাড়ে নি, আজও পহেলা বৈশাখকে ভুলে নি। আর এর ফলে আমরা হয়ত কিছুটা বেঁচে গেলাম, আর কিছুটা বেঁচে গেল আমাদের সংস্কৃতি।

ঐতিহ্যগত সংস্কৃতির প্রকাশ

আগেই বলা হয়েছে সংস্কৃতি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনধারা, তবে এর প্রভাব বিভিন্নভাবে হয়ে থাকে। নিম্নে কিছু উপকরণের (বস্তুগত ও অবস্তুগত) মাধ্যমে বাংলাদেশের ঐতিহ্যগত সংস্কৃতির বিভিন্ন প্রকাশ দেখানো যেতে পারে। আর এর দ্বারা পাওয়া যেতে পারে আমাদের উৎস এবং চেতনার সন্ধান।

১. উৎপাদন ব্যবস্থা

কোন সমাজের সাংস্কৃতিক পরিচয় তার উৎপাদন ব্যবস্থার উপর অনেকখানি নির্ভর করে। প্রাচীন কৌম সমাজে আমাদের পূর্বপুরুষরা গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে বসবাস করত, এটি ছিল শিকার (Hunting) এবং সংগ্রহমূলক (Gathering) সমাজ ব্যবস্থা। পরবর্তীতে অষ্ট্রিক ভাষাভাষীদের দ্বারা যে কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার প্রবর্তন হল, তা থেকে আমরা আজও বের হতে পারিনি। জোয়াল, লাঙ্গল, আর বলদ এখনো আমাদের উৎপাদনের মাধ্যম। সবচেয়ে বড় কথা হল, এই কৃষিভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে এদেশে একটি স্থায়ী সামাজিক জীবনের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। আর যার উপর ভিত্তি করে বিকশিত হয়েছে অন্যান্য সকল উপাদান।

২. যাতায়াত ব্যবস্থা

সুপ্রাচীন কাল হতে গরুর গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী, হাতি, পালকি, নৌকা ইত্যাদি ছিল যানবাহন। যদিও বর্তমানে পালকি, ঘোড়ার গাড়ী, এমনকি গরুর গাড়ীর ব্যবহার বিলুপ্ত হয়ে গেছে বলা যায়, কিন্তু এই কিছুদিন আগ পর্যন্ত গ্রামবাংলায় পালকি ছাড়া কনে পরিবহন হচ্ছে ভাবা যেত না। তবে উল্লেখ্য, ঐতিহ্যগত উপকরণ হিসাবে নৌকা এখনও আমাদের প্রধান বাহন হিসেবে ব্যবহৃত। আর এসব যানবাহনগুলোর ও রয়েছে নিজস্ব অনন্য সাধারণ আঙ্গিক।

৩. খাদ্যাভ্যাস

মাছ-ভাত না হলে বাঙ্গালীর চলে না, মাছ-ভাত বাঙ্গালীর প্রধান আহার্য্য। মেছোবাঙ্গালী ও ভেতোবাঙ্গালী আখ্যা পাবার প্রধান কারণ, সুপ্রাচীন কাল হতেই

অসংখ্য নদনদী অধ্যুষিত এ দেশে প্রচুরমাছ এবং প্রধান কৃষিপণ্য হিসাবে ধানের জন্যই ভাত হয়ে গেছে প্রধান খাদ্যবস্তু। কৃষির আবিষ্কার ফলে বিভিন্ন ফল ও তরিতরকারীও বাঙ্গালীর খাদ্যের অংশ। যেমন, অষ্ট্রিকভাষী লোকেরা কলা, লাউ, বেগুন, কুমড়ো, ঝিঙ্গে, কামরাঙ্গা, সুপারি ইত্যাদি চাষ করত-প্রমাণস্বরূপ বলা যায় ইত্যাদি শব্দ অষ্ট্রিকভাষা হতে এসেছে। তাছাড়া মাছের মত এতটা না হলেও মাংসের প্রতিও বাঙ্গালী অনুরক্ত। মোঘল প্রভাবে আজ বাঙ্গালীর উৎসবের খাদ্য পোলাও, কোর্মা, কালিয়া ইত্যাদি। তাছাড়া বাঙ্গালী শুধু মাছ-মাংসই খায় না, বিভিন্ন অঞ্চলভেদে পিঠাপুলি ও মিষ্টান্ন স্বতন্ত্র বৈচিত্র্যে উদ্ভাসিত। বাঙ্গালী যে অতিমাত্রায় রসনারসিক জাতি তা বিভিন্ন পরিব্রাজকের বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে। সর্বোপরি ধর্মীয় বিধানে বিশেষভাবে নিষিদ্ধ কয়েকটি দ্রব্য ব্যাতীত ধর্মসম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল বাঙ্গালীর খাদ্য তালিকা ও পাকপ্রণালী প্রায় অভিন্ন।

৪. বসন-ভূষণ

প্রাচীনকাল হতেই মেয়ে-পুরুষ সবাই সেলাই ছাড়া কাপড় ব্যবহার করত, যদিও সেলাই করা কাপড়ের প্রচলন হয়েছে অনেক পরে। মেয়েদের শাড়ী এবং হিন্দুদের ধুতি (যা এক সময় মুসলমানরাও পরিধান করত) ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে তা আজও টিকে আছে। বর্তমানে লুঙ্গি ধুতির স্থান গ্রহণ করেছে। তাছাড়া মুসলিম আগমনের ফলে পাজামা, পাঞ্জাবী আমাদের বসনের অংশ হয়ে গেছে। সবসময় লম্বা চুল রাখার রীতি প্রচলিত ছিল, যা মেয়েদের মধ্যে এখনও চালু। পাদুকার মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল কাঠের খড়ম, তাছাড়া লাঠি এবং ছাতা, যা সাধারণভাবে বাঙ্গালীরা ব্যবহার করত। একটা সময় ছিল যখন নারী পুরষ সবাই একই ধরনের অলংকার পরিধান করত। কানে, কুণ্ডল, গলায় মুক্তার মালা, হাতে বালা, মহিলারা শঙ্খ, চুড়ি ও পায়ে নুপুর পড়ত। সোনা-রুপার ব্যবহার সবসময় সমাজে একটা বিশেষ স্থান অধিকার করে ছিল। শাড়ী, সোনা, রুপা ছাড়া আমরা আজও কোন বাঙ্গালী ললনাকে কল্পনা করতে পারি না।

৫. প্রসাধন

এক সময় মেয়েরা চন্দনগুঁড়ো, মৃগনাভি আর জাফরান দিয়ে দেহ প্রসাধন করত। উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে প্রচলিত এসব প্রসাধন দুষ্প্রাপ্য হলেও সাধারণ শ্রেণীর মধ্যে প্রচলিত কপালের সিঁদুর, কাজলের টিপ, আলতা মাখা পা, রঞ্জিত ওষ্ঠ, হাতে মেহেদীর আলপনা আজও বাঙ্গালী রমনীদের সৌন্দর্য প্রকাশের ঐতিহ্যগত মাধ্যম।

৬. স্থাপত্যকীর্তি

আজকের মত সেকালেও গ্রামাঞ্চলে ঘরবাড়ি তৈরি হত মাটি, বাঁশ কাঠ-খড় দিয়ে। পাথরের স্বল্পতার কারণে রাজপ্রসাদ থেকে শুরু করে মসজিদ, মন্দির, বিহার

সবকিছুতেই ইটের প্রাধান্য। আর সেজন্যই এদেশের স্থাপত্য নির্দশন খুব বেশি টিকে নি। গ্রামবাংলার কুঁড়ে তৈরির রীতিই বিশিষ্ট স্থাপত্যরীতি। চৌকানো ভিতের উপর বাঁশ বা কাঠের খুঁটি ঘিরে বাঁশের চাচারি বা মাটির দেয়াল, তার উপর খড় বা ছনে ছাওয়া ধনুকাকৃতি চাল- বাংলার কুঁড়ে ঘরের এই হল বৈশিষ্ট্য। এ হতে আমরা আজও বের হতে পারি নি। বাড়ীর পিছনে বাঁশঝাড়, আম, জাম, সুপারিসহ বিভিন্ন ফলের গাছ, সামনে পুকুর, পাড়া ছাড়িয়ে চাষের ক্ষেত - এইত আমাদের সুপ্রাচীনকালের স্থাপত্য, আমাদের নিজস্বতা।

৭. **শিল্পকলা**

শিল্পকলা মননের ব্যাপার, হয়ত প্রয়োজনের দিকটিও এতে কম নয়। এই সেদিন পর্যন্ত কৃষি ব্যাতীত গ্রামবাংলার সমৃদ্ধির উৎস ছিল নানা রকম শিল্প। গ্রামের লোকদের দৈনন্দিন ব্যাবহারের বিভিন্ন সামগ্রী ও পালাপর্বনের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহ গ্রামের শিল্পীরাই তৈরি করত। প্রয়োজন মেটানোর তাগিদ ছাড়াও তারা তাদের উৎপাদিত বিভিন্ন পণ্যকে শৈল্পিক রূপায়ন দেবার চেষ্টা করেছে। ফলে অঞ্চলভেদে বা গোত্রভেদে একটা আলাদা বিশেষায়ন গড়ে উঠেছিল। ঢাকাই মসলিন বা শঙ্খশিল্প, সিলেটের গজদন্ত বা বেতশিল্প, রাজশাহীর রেশমশিল্প, পাবনা-টাংগাইলের বস্ত্রশিল্প, চট্টগ্রামের নৌ ও দারুশিল্প সহ বাংলার কাঁথা, শিকা, আল্পনা, কাঁসা-পিতলের দ্রব্য, কূলা, কাঠ বা খোদাইয়ের কাজ, পটশিল্প, মৃৎশিল্প ইত্যাদি সবই বিশ্বজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। আর এসবই আমাদের ঐতিহ্যগত শৈল্পিক স্বকীয়তার নিদর্শন।

৮. **ধর্ম-দর্শন**

ধর্ম সংস্কৃতির একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। আর এদেশে এই উপাদানটিই সবচেয়ে বেশী বির্বতিত হয়েছে। বিবর্তনের ধারায় যেসব নব নব ধর্মবিশ্বাস বাংলার মাটিতে এসেছে সেগুলোকে এদেশবাসী তাদের প্রাচীন ঐতিহ্যিক উত্তরাধিকারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে নিয়েছে। নতুনের সঙ্গে প্রাচীনকে মিলিয়ে এক অপূর্ব Synthesis তৈরি করা হয়েছে। হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খৃষ্টান সবাই মিলে এক Integrated বাংগালী সংস্কৃতি গড়ে তুলেছে। এখানে তাই লালন বলতে পারেন, 'পৈতা দিয়েত ব্রাহ্মণকে চিনলাম, কিন্তু বামনীকে চিনব কিভাবে?' চন্ডিদাস তাই লিখতে পারেন, 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।' নজরুল তাই গাইতে পারেন সাম্যবাদের গান। এখানে ধর্মীয় উৎসব সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় উৎসব ও বটে। ঈদ, দূর্গাপূজা, মহররম, বড়দিন, বুদ্ধপূর্ণিমা এ জাতীয় বড় বড় ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলোতে সকল ধর্মমতের অংশগ্রহণ বাংলার কালচারকে অসাম্প্রদায়িক সংস্কৃতির মিলনক্ষেত্র বানিয়েছে।

অন্যদিকে এদেশের প্রধান ধর্মগুলোর দার্শনিক ভিত্তি বিবেচনায় দেখা যায়;

ক) ময়নামতি, পাহাড়পুর, মহাস্তানগড় প্রভৃতি প্রাচীন জ্ঞান ও সভ্যতার কেন্দ্রভূমিতে বৌদ্ধ সংস্কৃতির যে পরিচয়, তাতে আছে এক শংকর ধর্মবোধের উপস্থিতি। তবে উল্লেখ্য, ঐসব স্থানে বাংগালীর শিল্প, সভ্যতা ও সংস্কৃতির চিহ্ন রয়েছে তা বাংলাদেশের ঐতিহ্যের আদি উৎস। বৌদ্ধ ধর্মের সাথে জড়িত আছে তান্ত্রিক সাধন পদ্ধতি, বুদ্ধদেবও তার পাশাপাশি আছেন। বৌদ্ধ ধর্ম সাম্যবাদী ধর্ম রূপে গৃহীত হলেও বাংলার তান্ত্রিকতাও এর সাথে যুক্ত।

খ) হিন্দু সংস্কৃতি ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি, এটি বর্ণ-শ্রমভিত্তিক ধর্ম। এই সমাজের ধর্মবিশ্বাসের লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে দেবী প্রাধান্য। দূর্গা, কালী থেকে শুরু করে এই তালিকাটি দীর্ঘ। উত্তর ভারতের অন্যান্য জায়গায় সাথে এ ব্যপারে বাংলাদেশের হিন্দু সমাজের পার্থক্য রয়েছে। ধারণা করা হয় এর পিছনে আছে কৃষিভিত্তিক কৌমসমাজের মাতৃতন্ত্রের ছাপ।

গ) প্রধানতঃ সুফী, দরবেশ শ্রেণীর লোকদের দ্বারাই এ দেশে ইসলাম প্রচারিত হয়। তাঁরা বিভিন্ন দর্শন ও ধর্মমতের সংগে পরিচিত ছিলেন, নানাবিধ তরিকায় বিভক্ত ছিলেন এবং কেরামতির অধিকারী ছিলেন। পীর-মুরীদি প্রথা প্রবর্তনের মাধ্যমে তারা প্রেম-ভক্তিবাদ ও গুরুশিষ্যবাদ প্রচার করেছিলেন। অর্থাৎ মুল উৎপত্তিস্থল থেকে ইসলাম অনেক পরিবর্তিত রূপে এসেছিল, তবে ইসলামী দর্শনের মূল সাম্যবাদ বা মানবতাবাদ- যা এদেশের ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে আকৃষ্ট করেছিল। তাই হিন্দু, বৌদ্ধ অনেক আচার আচরণ এর সঙ্গে মিশে এক স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিকরূপ পরিগ্রহ করেছে। ইসলাম পরবর্তী বাংলায় হিন্দু-মুসলিম সাধারণ মানুষের মধ্যে ভক্তিবাদ সর্বব্যাপী শক্তিরূপে বিদ্যমান।

৯. সামাজিক জীবন

সামাজিক জীব হিসেবে এবং সমাজের সদস্যরূপে মানুষের ক্রিয়াকর্মের মধ্যে সংস্কৃতি মূর্ত হয়ে উঠে। ঐতিহ্যবাহী এই সমাজের প্রাণকেন্দ্র হল পরিবার, পরিবারই আমাদের প্রধান প্রতিষ্ঠান। যুগ যুগ ধরে পারিবারিক বন্ধন ও আদর্শের প্রতি আমাদের অবিচল আস্থা। পরিবারই সামাজিকীকরণ এবং সমাজ নিয়ন্ত্রণে প্রধান ভূমিকা পালন করে। অন্যদিকে সুপ্রাচীন কাল হতে এদেশের মানুষ একধরণের সম্প্রদায়গত মনমানসিকতা নিয়ে বেড়ে উঠেছে। বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামই যেন এক একটি সম্প্রদায়। পারিবারিক বিষয়, সম্পত্তির বন্টন, ঝগড়া বিবাদসহ বিভিন্ন সালিশ গ্রামীণ সম্প্রদায়ই করে থাকে।

এদেশের সামাজিক জীবনের মধ্য দিয়ে ঐতিহ্যবাহী বাঙ্গালী সংস্কৃতির আরও নির্দশন চোখে পড়ে; যেমন, বাঙ্গালীর আতিথেয়তা, সরলতা, সহনশীলতা, বিভিন্ন উৎসব-উদযাপন প্রিয়তা ইত্যাদি। তাছাড়া এদেশের সমাজ জীবন থেকে প্রাচীন মাতৃতান্ত্রিক কৌমসমাজের স্মৃতি একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় নি। মামা বাড়িতে ভাগ্নের অধিকার, হিন্দুর বিয়েতে সম্প্রদানের ব্যাপারে মামার অধিকার, বিভিন্ন ব্রত অনুষ্ঠানে মেয়েদের ভূমিকা বা সম্পত্তিতে মেয়েদের অধিকার এর নিদর্শন। অন্যদিকে বিয়ে থেকে শুরু করে বিভিন্ন লোকাচার বা ধর্মানুষ্ঠানের সাথে সম্প্রদায় নির্বিশেষে ধানের গুচ্ছ, কলা, হলুদ, পান, সুপারির ব্যবহার আজও কৃষিভিত্তিক কৌমসমাজের স্মৃতিকে বহন করছে।

১০. বিশ্বাস, সংস্কার, আচার

এদেশের সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায় কিছু বিশ্বাস, সংস্কার বা আচার মেনে চলে। এই বিশ্বাস, সংস্কার এবং আচারগুলোর কিছু অংশ নির্দিষ্ট করে চিহ্নিত করা যায়, আর কিছু অংশ সমন্বিত সম্প্রীতির উদাহরণ। যুগ যুগ ধরে পালনের মাধ্যমে এগুলো আমাদের ঐতিহ্যগত সংস্কৃতির অংশ হয়ে গেছে। আর এসব বিশ্বাস এবং আচরণগুলোর প্রভাব আমাদের সমাজে অত্যন্ত বেশী। কিছু উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়; আজও এখানকার হিন্দু-মুসলমান প্রায় সবাই দৈব গণনায় বিশ্বাস করে, বিয়েশাদী, গৃহনির্মাণ বা কোথাও যাত্রার সময় দিনক্ষণের বিচার করা হয়। হিন্দু কবিরাজ ঠাকুরের নিকট মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকজন আরোগ্য লাভের জন্য যায়, অন্যদিকে আরোগ্য বা অভিষ্ট লাভের জন্য পীর আউলিয়ার দরবারে হিন্দু-মুসলিম সবাই প্রার্থনা এবং মানত করে। আপদ বিপদ হতে মুক্তি লাভের জন্য অমূল্য মনে করে এদের দেয়া মাদুলী, পানিপড়া, চালপড়া, তেলপড়া ইত্যাদির উপর। অশুভ দৃষ্টির প্রভাব মুক্ত হবার জন্য কালো হাঁড়ির গায়ে সাদা রংয়ের ক্রশ বা চিহ্ন একে লটকিয়ে দেয় বাঁশের খুটির মাথায়। এই সেদিন পর্যন্ত মহামারীর সময় শীতলা দেবী, ওলা বিবিকে সন্তুষ্টু রাখতে ব্যস্ত ছিঁল সাধারণ মানুষ।

জীবনের বিভিন্ন ক্রান্তীকালীন উত্তরণ অনুষ্ঠানে (Rites of passage & rites of transition) আমাদের সমাজে পালন করা হয় বিচিত্র আচার। যেমন, সন্তান-জন্ম, বিয়ে বা মৃত্যুর সময় এখানে বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালন করা হয়। তাছাড়া হাতেখড়ি, মুখেভাত, বিয়ের সময় গায়ে-হলুদ, শুভদৃষ্টি, ধানদূর্বা দিয়ে বধুবরণ- এ সবই সমন্বিত সংস্কৃতির প্রকাশ। কৃষি, ঋতু ও শস্য বিষয়ক উৎসব এবং আচারগুলি যেমন, ব্রত, নবান্ন, বর্ষাবরণ, শারদোৎসব, বসন্তোৎসব প্রভৃতির উৎস সুপ্রাচীনকালের

মানুষের ধ্যানধারণা, সংস্কার-বিশ্বাস এবং আজও এসবের মধ্যে কোন পরিবর্তন আসেনি।

১১. রাজনীতি

রাজনৈতিক চেতনাও সংস্কৃতির বাইরে নয়। ঐতিহাসিক কাল হতে এ অঞ্চলের জনগোষ্ঠী রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত সচেতন, গণতন্ত্রমনা এবং স্বাধীনচেতা। তাইতো যুগ যুগ ধরে এ অঞ্চলে স্বাধীন রাষ্ট্র এবং বাংলা ভাষা সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। ইংরেজ অধিকারের পর প্রধান প্রধান আন্দোলনগুলো এখান হতেই শুরু হয়েছিল। ফরায়েজী আন্দোলন, সিপাহী বিদ্রোহ, তেভাগা আন্দোলন এক্ষেত্রে উল্লেখ্য- আর এসব ধারাবাহিকতার ফলাফল হল আজকের বাংলাদেশ। অর্থাৎ রাজনীতির ক্ষেত্রে স্বাধীনচেতা এবং গণতন্ত্রমনা মানসিকতাই আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ঠিকানা।

১২. ভাষা ও সাহিত্য

ভাষা ও সাহিত্যের মাধ্যমে কোন অঞ্চল বা জাতির সাংস্কৃতিক পরিশীলতার সুস্পষ্ট পরিচয় ফুটে উঠে। ‘চর্যাপদ’ বাংলা ভাষার শৈশবকাল, ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে’ তা কৈশরে পদার্পণ করেছে এবং শাহমুহাম্মদ সগীরের ‘ইউসুফ-জোলেখা’য় তা যৌবন্মুখ হয়েছে। অতঃপর ‘মনসামঙ্গল’, ‘ধর্মমঙ্গল’, ‘চন্ডীমঙ্গল’, ‘রামায়ন’, ‘মহাভারতে’ বাংলাভাষার যৌবনপ্রাপ্তি হয়েছে। অন্যদিকে ‘গাজীর গান’, ‘ময়মনসিংহ গীতিকা’র মত কাহিনী কাব্য বা রূপকাহিনী (যেমনঃ ঠাকুমা’র ঝুলি) ইত্যাদি দ্বারা বাংলা সাহিত্য নেমে এসেছে রাজদরবার ছেড়ে পর্ণ কুটিরে, হাটে, মাঠে, পথে-সাধারণ মানুষের মাঝে। ভাষা ও সাহিত্যের এই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে প্রতিষ্ঠা করতে বাঙ্গালী জাতি বুকের তাজা রক্ত বিলিয়ে দিতেও পিছপা হয় নি।

১৩. সংগীত

নদীর দেশ বাংলাদেশ, গানের দেশ বাংলাদেশ। আমাদের ঐতিহ্যগত সংগীতের ভিত্তি পল্লী। পল্লী মানুষের প্রাণের কথা, মনের কথা, হৃদয়ের আকুলতা পল্লীগানে অপরূপ রূপে প্রতিফলিত। আমাদের দেশজ সংগীতগুলো মণিখচিত রত্নবিশেষ। এর তালিকা অতিদীর্ঘ, যার প্রত্যেকটি বিস্তৃত আলোচনার দাবী রাখে। শুধু বলা যায় বাউল, ভাটিয়ালী, ভাওয়াইয়া, গম্ভীরা, জারী, সারী, মুর্শেদী, পালাগান, কীর্তন, রাখালিয়া, মারফতীসহ নানাবিধ সংগীত, যা এদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হিসেবে অনন্য মর্যাদায় আসীন।

১৪. নৃত্য

লৌকিক ও সামাজিক নাচগানে বাস্তব জীবনের প্রেম-ভালবাসা, আনন্দ-উল্লাস ও আমোদস্ফূর্তি প্রকাশ পায়। হিন্দু-মুসলিম কৃষক সমাজের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে একসময় নাচের খুব প্রচলন ছিল। সাধারণতঃ ঐতিহ্যগত নৃত্যবলতে আমাদের দৃষ্টি চলে যায় বিভিন্ন উপজাতীয় নৃত্যের প্রতি। মনিপুরী নৃত্য এবং সাওতালদের ঝুমুর নৃত্য এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু সাধারণ বাঙ্গালী সমাজে ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নৃত্যের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসবকে কেন্দ্র করে এদেশের বিভিন্ন ঐতিহ্যগত নৃত্য হচ্ছে, গাজননৃত্য, ব্রতনৃত্য, পুতুল নাচ, মইথারাণীর নাচসহ নানাবিধ অঞ্চলভিত্তিক নাচ।

১৫. চিত্রকলা

আমদের ঐতিহ্যগত চিত্রশিল্প মুলতঃ পুঁথিচিত্র ও পটচিত্র, তাছাড়া লক্ষ্মীর সারাচিত্রও এর অন্তর্ভুক্ত। আর আছে সখেরহাঁড়ি এবং কলসিচিত্র। আমাদের চিত্রশিল্পের ঐতিহ্যটি লোকশিল্পকলার বিভিন্ন উপকরণের মাঝে মূর্ত হয়ে উঠে। সমাজ জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-আনন্দ, গার্হস্থ্য ও কর্মময় জীবনের প্রতিচ্ছবি এদেশের শিল্পীদের তুলিতে সবসময় মূর্ত হয়ে উঠেছে-আর এর মাধ্যমে আমরা খুঁজে পাই আমাদের শেকড়ের সন্ধান।

১৬. খেলাধুলা

বাংলার খেলার মধ্যেও নিজস্ব ঐতিহ্য রয়েছে। গোল্লাছুট, ছাউসি, হাডুডু বা দাড়িয়াবাধা, নৌকাবাইচ, মোড়গলড়াই, ষাঁড়লড়াই, ঘোড়দৌড় ইত্যাদি এদেশের নানাবিধ নিজস্ব খেলা। আর এসব খেলার সাথে জড়িয়ে আছে অতীত ইতিহাস, উৎসব, আচার-অনুষ্ঠানসহ বিভিন্ন জাতির সহাবস্থান বা ভাবের আদান প্রদানের অলিখিত ইতিহাসের যোগসূত্র।

ঐতিহ্যগত সংস্কৃতি এবং বর্তমান বাংলাদেশ

একথা বলতে দ্বিধা নেই যে, আজ বাংলাদেশ তার নিজস্বতা থেকে অনেক দূরে সরে যাচ্ছে। এর কিছুটা ঐচ্ছিক, কিছুটা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়া এবং বাকিটা বিশ্বায়নের ফল। আমাদের জীবনযাত্রার বিভিন্ন ক্ষেত্র হতে আজ ঐতিহ্যগত সাংস্কৃতিক নিদর্শনগুলোর অনেক কিছুই হারিয়ে যেতে বসেছে। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ব্যাপক লেনদেন থাকবেই, যা অস্বীকার করার নয়, কিন্তু তার সাথে আবশ্যিকভাবে নীতি-নৈতিকতার একটি সম্পর্ক রয়েছে। নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠী তাদের নৈতিকতার মানদন্ডে আচরণসমূহ নির্ধারণ করে থাকে বিধায় সংস্কৃতির একটি বিশেষ নিদিষ্ট রূপ রয়েছে। আর এ থেকে দূরে সরে যাবার অর্থই হল মানবিক মূল্যবোধের

পশ্চাদমুখিতা। মনোজগত এর সমৃদ্ধি সংস্কৃতিতে প্রতিফলিত হবেই, অর্থাৎ যা কিছু সুন্দর, কল্যাণকর এবং বাস্তব তা গ্রহণে সংস্কৃতি শুধু বিকশিতই হতে পারে। কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে সংস্কৃতির নিজস্ব ধারাটি কি অবক্ষয়ের দিকে যাচ্ছে না? অর্থাৎ সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে নীতি ও নৈতিকতার সম্পর্ক আছে তা থেকে আজ আমরা অনেক দূর- এ কথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। দুঃখের সাথে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে আমাদের জনগোষ্ঠীর মনোজগত, মূল্যবোধ, তথা সংস্কৃতি ভাবনা সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে যে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের দরকার তার অভাব দেখা যাচ্ছে। নেতৃত্বস্থানীয় পর্যায় থেকে নিজস্ব সংস্কৃতির ধারাকে বেগবান করার চেষ্টা অব্যাহত না রেখে বরং ক্ষেত্র বিশেষে তাকে পশ্চাৎমুখী করার প্রবনতা দেখা যাচ্ছে। আমাদের ঐতিহ্যগত সংস্কৃতির ধারাবহিকতা, এক কথায় আমাদের নিজস্বতা ও স্বকীয়তা আজ প্রশ্নের সম্মুখীন। আজকে আমাদের সংস্কৃতিকে সাম্প্রদায়িকতার দ্বারা আঘাত করা হচ্ছে, সংস্কৃতিতে আনা হচ্ছে শ্রেণীবোধ, ভাষাকে করা হচ্ছে অবজ্ঞা-যা কোন ভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। বলতে দ্বিধা নেই, শহুরে তথাকথিত বিদগ্ধজনেরা সংস্কৃতির এই দুঃখজনক পরিণতির জন্য অনেকক্ষেত্রেই দায়ী। তাঁরা তাঁদের জীবনযাত্রায় বাঙ্গালীয়ানা প্রভাব মুছে ফেলতে চান এবং পরবর্তী প্রজন্মের উপরও এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়ছে। পোষাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যাভ্যাস থেকে শুরু করে সামগ্রিক জীবনযাত্রার বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঐতিহ্যগত সংস্কৃতির নিদর্শন কতটুকু দেখা যায়, তা নিয়ে বির্তকের অবকাশ রয়েছে। শুধু মাত্র বিশেষ কয়েকটি উৎসব উদযাপন অনুষ্ঠানের মধ্যেই আজ বাংগালী সংস্কৃতির মেরুকরণ হয়েছে। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না, পৃথিবীর অনেক উন্নত দেশই, যেমন নরওয়ে, তাদের ঐতিহ্যগত সংস্কৃতির প্রতি যথেষ্ট অনুরক্ত এবং তারা তাদের নিজস্ব সংস্কৃতিকে উচ্চে তুলে ধরা ও রক্ষা করার জন্য নিরলস চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। যাই হোক, এই ভারাক্রান্ত আলোচনায় না গিয়ে শুধু বলা যায় বর্তমান বাংলাদেশে ঐতিহ্যগত সংস্কৃতির যে ক্ষীয়মান নিদর্শন লক্ষণীয় তা যেন হারিয়ে না যায় এবং সর্বোপরি সেটা রক্ষা করার চেষ্টাই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

উপসংহার

উপরোক্ত আলোচনায় সংস্কৃতি প্রত্যয়টির তাত্ত্বিক অবয়ব এবং এর বিভিন্ন উপকরণের মাধ্যমে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের একটি সাধারণ রূপরেখা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মূলে ছিল এক অনন্য সাধারণ ঐক্যবোধ- ধর্মীয় ব্যবধান এ ক্ষেত্রে কোনদিনই তেমন কোন বিরোধ সৃষ্টি করতে পারে নি, এবং পারবেও না। ঐতিহ্যগত সংস্কৃতির বহিঃপ্রকাশের মাধ্যমেই মূর্ত হয়ে উঠে একটি জাতি বা সমাজের পরিচয়। বর্তমানে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে

আমরা যতই এগিয়ে যাই না কেন-আমাদের পরিচয় কিন্তু আমাদের মূলে, আমাদের নিজস্বতায়। সকলের তাই চেষ্টা করা উচিত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে কিভাবে রক্ষা করা যায়। সরকার, বুদ্ধিজীবী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ সকলকে এই ঐতিহাসিক সত্যটি উপলব্ধি করে সংস্কৃতিকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসা উচিত। আমরা যদি ঐতিহ্যগত সাংস্কৃতিক উপাদনাগুলোকে রক্ষা করতে না পারি, তবে জাতি হিসেবে বিশ্বের দরবারে আমাদের কোন অস্তিত্ব থাকবে না। পরিশেষে বলা যায়, সমাজ রক্ষা করার জন্য যেমন সংগঠন বা সংঘের প্রয়োজন হয়, তেমনি ঐতিহ্যগত সংস্কৃতিকে রক্ষা ও তার স্বরাজ বজায় রাখতেও সেরূপ সংঘ গড়ে তোলা প্রয়োজন। সংস্কৃতির অনুশীলন এবং লালনকে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যরূপে নির্ধারণ করা হোক এসব সংঘগুলোর দর্শন। আর এই সত্যটা আমাদের সকলের উপলব্ধি করা উচিত। বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি অত্যন্ত সমৃদ্ধ, বর্তমান আলোচনা শুধু এর একটি ক্ষুদ্র অংশের প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়।

সহায়ক তথ্য নির্দেশিকা

আফসারউদ্দীন, মুহাম্মদ (সম্পাদিত), *এ. কে. নাজমুল করিম স্মারক গ্রন্থ,* ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ১৯৮৪

আহসান, সৈয়দ আলী, *আমাদের সংস্কৃতি, দৈনিক বাংলা,* ৭ই ডিসেম্বর, ১৯৮৯

ইসলাম, মুস্তফা নুরুল (সম্পাদিত), *বাংলাদেশঃ বাঙ্গালী আত্মপরিচয়ের সন্ধানে,* ঢাকা সাগর পাবলিশার্স, ১৯৯০

ওয়াইজ, জেমস, *পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জাতি বর্ণ ও পেশার বিবরণ,* ঢাকা ইউনিভার্সিটি প্রেস লিঃ, ১৯৯৮

খান, শামসুজ্জামান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের লোক ঐতিহ্য,* ঢাকা বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫

চৌধুরি, আনোয়ার উল্লাহ (এবং অন্যান্য), *সমাজ বিজ্ঞান শব্দকোষ,* ঢাকা বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫

মহাপাত্র, অনাদিকুমার, *বিষয় সমাজতত্ত্ব,* কলিকাতা ইন্ডিয়ান বুক কনসার্ন, ২০০০

রহমান, মুহাম্মদ হাবিবুর, *সমাজবিজ্ঞান পরিচিতি,* ঢাকা হাসান বুক হাউজ, ১৯৮৮

রায়, অজয়, *বাঙ্গলা ও বাঙ্গালী,* ঢাকা খান ব্রাদার্স এন্ড কোং, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ

সামাদ, এবনে গোলাম, *নৃতত্ত্ব,* ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮২

সুর, অতুল, *বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর বিবর্তন,* কলকাতাঃ সাহিত্যলোক, ১৯৯৪

সেন, রংগলাল, *বাংলাদেশের সামাজিক স্তরবিন্যাস,* ঢাকা বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭

হাফিজ, আব্দুল, *বাংলাদেশের লৌকিক ঐতিহ্য,* ঢাকা বাংলা একাডেমী, ১৯৭৫

Hellman, C.G. ***Culture, Health and Illness,*** Oxford: Butterworth-Heinemann ltd., 1990

Macivar, RM & Page, CH, ***Society***, London: Macmillan & Co., 1959

Patwari, Mafizul Islam, A.B.M (edt.), ***Human Rights in Contemporary International Law***, Dhaka: Humanist and Ethical Association of Bangladesh, 1995

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা,
সপ্তম বর্ষ সংখ্যা কার্তিক ১৪০৯

বাংলাদেশে বাল্যবিবাহের স্বরূপ ও ফলাফল ঃ একটি সমীক্ষা

মোহাম্মদ জুলফিকার হোসেন *
মোহাম্মদ সেলিম **

Nature and Consequence of Child Marriage in Bangladesh - A Study

Abstract : This article deals with an inquiry into the nature and consequences of child marriage in Bangladesh. It is an outcome of a study conducted over two villages with prime objectives of identifying the major causes of child marriage and its overall impact on socio economic aspects of rural women. Still in the new millennium, child marriage is a matter of great concern to all conscious sections of people and barrier to sustainable development effort attempted for upliftment of rural people, specially, for mother and child health care facilities. In Bangladesh, child marriage is a widely practiced tradition which is considered as a terrible social problem and to some extent a curse for the village women and for the rural society. The tendency of early marriage is observed in an acute form in rural society rather than urban society due to wider disparities in income distribution and other necessary benefits initiated by the Government.

Mainly women section in rural Bangladesh are the victim of negative consequences of early marriage. They are to bear the sufferings of early marriage from the very beginning of their marriage to death. It is hightime to take necessary steps to free the society from the curse of early marriage. But no initiatives could combat the problem if the roots of early marriage remain uncovered.

ভূমিকা

বালিকারা বধু হয়। গ্রামীণ সমাজে এটি একটি স্বাভাবিক চিত্র। বাল্যবিবাহের অভিশাপ নারী জীবনকে অন্ধকারে ফেলে দেয়। বাল্যবিবাহ একটি শারীরিক সমস্যাতো বটেই, সামাজিক সমস্যাও। ফলাফলে জন্মে অপুষ্ট শিশু যা অর্থনীতির

---

* সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রনীতি ও লোক প্রশাসন বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।
** সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রনীতি ও লোক প্রশাসন বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

উপর বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। গ্রামীণ সমাজে অশিক্ষা, অজ্ঞানতা, দারিদ্র ইত্যাদি নানা কারণে বাল্যবিবাহের মাত্রা বেড়ে যাচ্ছে। গ্রামের সচেতন ব্যক্তিরাও এ ব্যাপারে তেমন কিছু বলছে না, নেই কোন সামাজিক আন্দোলন। বরং গ্রামে দেখা যায় ১৩/১৪ বছরে মেয়েকে বিয়ে না দিলে গুঞ্জন ওঠে, অভিভাবককে আতঙ্ক ও চরম ভোগান্তির মধ্যে দিনযাপন করতে হয়। বাল্যবিবাহ সম্পর্কে আইন রয়েছে ঠিকই কিন্তু এ আইনের প্রয়োগ নেই। বিয়ে সম্পর্কে প্রচলিত রীতি, উপযুক্ত বয়স নির্ধারণ, জীবন সঙ্গী বেছে নেওয়ার পদ্ধতি নির্ভর করে পরিবার সম্পর্কে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী, পরিবারের ভূমিকা, কাঠামো, জীবনধারা ও পরিবারের সদস্যদের দায়িত্ববালীর ওপর।

আইনের বিধান অনুযায়ী বাল্যবিবাহ বলতে সে বিয়েকে বুঝায় যেখানে সম্পর্ক স্থাপনকারী পক্ষদ্বয়ের মধ্যে যে কোন একজন শিশু। আর শিশু বলতে তাকেই বুঝায় যার বয়স পুরুষ হলে ২১ বছরের কম এবং নারী হলে ১৮ বছরের কম।

রাষ্ট্রীয় আইনে ১৮ বছরের কম বয়সী মেয়ের বিয়ে দেয়া দণ্ডনীয় অপরাধ। জাতিসংঘ শিশু সনদেও নিষেধ রয়েছে। বিয়ের ক্ষেত্রে আইনগত ন্যূনতম বয়সে পৌছার আগেই যে সকল শিশু ও কিশোরী বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় পরিসংখ্যানে তারা শিশু হিসাবে বিবেচিত হয় না। ফলে কোন পুরুষ ১২-১৩ বছর বয়সী কোন মেয়ের সাথে বিবাহ বহির্ভূত যৌন সম্পর্ক স্থাপন করলে আইনের দৃষ্টিতে সে অপরাধী বিবেচিত হলেও বিয়ের ছত্রছায়ায় এ যৌন সম্পর্ক স্বীকৃত।

বাল্যবিবাহের পরিসংখ্যান এবং এর ব্যাপকতা নিরূপণ করা অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না। এর কারণ অনেক ক্ষেত্রেই রেজিস্ট্রেশন এবং জন্ম নিবন্ধীকরণ না হওয়া। ১৪ বছর বয়সের নিচে বিয়ে সংক্রান্ত তথ্য খুব কম দেশেই রয়েছে। আর ১০ বছরের নিচে এ তথ্য আরও অধিকাংশ ক্ষেত্রে বর্ণনা ভিত্তিক, তবে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, এ দেশে ১৯ বছরের কম বয়সী মেয়েদের প্রায় অর্ধেকেরই বেশী বিবাহিত এবং এই বয়সের শতকরা ৫৮ ভাগ ইতিমধ্যেই মা হয়েছে অথবা সন্তানসম্ভবা।[১] পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, ১০-১৪ বছর বয়সী মেয়েদের মধ্যে শতকরা ৫ ভাগ ও ১৫-১৯ বছর বয়সী মেয়েদের মধ্যে শতকরা ৪ ভাগ বর্তমানে বিবাহিত।

গবেষণার উদ্দেশ্য এবং পদ্ধতি

এ গবেষণা প্রবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে গবেষণা এলাকার বাল্যবিবাহের ব্যাপকতা সম্পর্কে ধারণা লাভ, এর জন্য দায়ী কারণগুলো চিহ্নিত করা, প্রাপ্ত তথ্য ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে বাল্যবিবাহের ফলাফল ব্যাখ্যা করা এবং এ সামাজিক সমস্যাটি দূরীকরণে কিছু সমাধান সুপারিশ করা। এ ছাড়াও বাংলাদেশে বিবাহ সম্পর্কে গ্রামীণ

মনোভাব, বাল্যবিবাহের ব্যাপকতা, এর কারণ, পটভূমি এবং প্রভাব, আইনগত জটিলতা বিশ্লেষণপূর্বক বিবাহের হার কমিয়ে আনা এবং এ অভিশাপটি প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে কিছু সুপারিশ পেশ করা। গ্রাম পর্যায়ে বাল্যবিবাহের একটি চিত্র খুঁজে পাবার লক্ষ্যে কুষ্টিয়া জেলার ভেরামারা উপজেলার বাহাদুরপুর ইউনিয়নের দুটি গ্রাম মেঘনাপাড়া এবং মাধবপুর গ্রামকে পর্যবেক্ষণ এলাকা হিসাবে নির্বাচন করা হয়। মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য কাঠামোগত প্রশ্নশালা প্রণয়ন করে সেই অনুযায়ী উক্ত গ্রামের বিবাহিত মহিলাদের (যাদের বয়স ১২-৩৫ বৎসর) সাথে আলোচনার ভিত্তিতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। সাধারণতঃ নিম্ন আয়ভুক্ত পরিবারকেই উত্তরদাতা হিসাবে নির্ধারণ করা হয়। সঠিক তথ্য পাবার জন্য গবেষক মহিলা তথ্য সংগ্রহকারী নিয়োজিত করেন। গবেষণাটি ২০০২ সালের জানুয়ারি - এপ্রিল সময়ের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। এ ছাড়া গবেষক প্রাথমিক তথ্যের পাশাপাশি বিভিন্ন পত্রপত্রিকা, ইতোমধ্যে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধ ও বই থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন।

সীমাবদ্ধতা

- মাঠ পর্য্যায়ে তথ্য সংগ্রহের সময় গবেষক কেবল পরিবারের যে সদস্য উপস্থিত ছিল তার কাছ থেকেই তথ্য সংগ্রহ করেন।
- কোন কোন প্রশ্নে উত্তরদাত্রী কেবল তাদের নিজস্ব ধারণা থেকে তথ্য প্রদান করেন।
- মহিলা সাক্ষ্য গ্রহণকারী তথ্য গ্রহণ করা সত্ত্বেও অনেক মহিলা উত্তরদাত্রী ব্যক্তিগত ও পারিবারিক অনেক প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করেন।
- সময় সীমাবদ্ধতার কারণে ব্যাপকভাবে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।
- দুর্বল যাতায়াত ব্যবস্থা গবেষণা পরিচালনার ক্ষেত্রে একটি বাধা হিসাবে কাজ করেছে।

বাল্যবিবাহ ও গ্রামীণ মনোভাব

গ্রামীণ পরিবেশে একদিকে যেমন ছেলেরা একটু বড় হলেই অভিভাবকরা তাদের কাজে পাঠানোর জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন, অন্যদিকে তেমনি অল্প বয়সে মেয়েদের বিয়ে দেয়ার জন্যও অভিভাবকরা উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। বাল্যবিবাহের ফলে মেয়েদের শরীর যে ভেঙ্গে যায় কিংবা কৈশোরে গর্ভবতী হওয়া যে ঝুঁকিপূর্ণ তা মানতে চায় না গ্রামের লোকেরা। তারা বলেন মেয়েদের ১৩/১৪ বছরে বিয়ে হওয়াটাই ভাল। অল্প বয়সে বাচ্চা নেয়াকে তারা ক্ষতিকর মনে করেন না। তাদের ধারণা মেয়ে মানুষতো বাচ্চা জন্ম দেয়ার জন্যই, এটাই চিরাচরিত নিয়ম। আইনের কথা বললে অনেক নারী

ক্ষেপে যান। তারা বলেন যার মেয়ে সে বিয়ে দিবে, এতে আবার আইনের কি আছে? মেয়ে বিয়ে দেয়া একান্ত নিজস্ব ব্যাপার বলে মনে করে গ্রামের জনগণ। বাল্যবিবাহের পর জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণের ক্ষেত্রেও কখনও কখনও নারীদের বিভিন্ন সমস্যা হচ্ছে। কিন্তু এ ব্যাপারে স্বামীদের দায়দায়িত্ব খুব একটা নিতে দেখা যায় না। অনেক মাতা মনে করেন এবং বলেন মেয়ের জন্য ঠিকমত খাবার জোটাতে পারি না, কতদিন মেয়ে অনাহারে থাকবে? খাবারের জন্য হয়তো সে একসময় কাজ জুটিয়ে নেবে। কাজ খোঁজার সময় কাজ দেয়ার নামে মানুষ একদিন মেয়ের ইজ্জত নেয়ার চেষ্টা করবে। তার চেয়ে মেয়েকে বিয়ে দিলেই সব সমস্যার সমাধান হয়।

বাল্যবিবাহ ও শিশু অধিকার

বাল্যবিবাহ শিশু অধিকারের পরিপন্থী। বেশিরভাগ দেশই প্রচলিত আইনে বিয়েতে স্বাধীনভাবে নারীর সম্মতি দানের অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়। কিন্তু বহু দেশেই এ আইন প্রতীকী মাত্র। ১৯৯২ সন থেকে প্রতি বছর বাংলাদেশ শিশু অধিকার সম্পর্কে সমাজের সকলের জন্য সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে শিশু অধিকার সপ্তাহ পালন করে। এ ধরনের অধিকার শিশুদের সবসময়ই রয়েছে। তবে এর পরিপূর্ণ প্রকাশ রয়েছে জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদে যা ১৯৯০ সনের সেপ্টেম্বরে আন্তর্জাতিক আইনে অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৯৭ সনের ১লা জুলাই পর্যন্ত ১৯১টি দেশ এ সনদটি অনুমোদন করেছে এবং এটি ব্যাপকভাবে গৃহীত মানবাধিকারের চুক্তিতে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশ বিশ্ব শিশু সম্মেলনের ঘোষণায় অন্যতম স্বাক্ষরদাতা দেশ এবং এসব লক্ষ্য অর্জনের জন্য একটি জাতীয় কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সনদের সামগ্রিক বৈশিষ্ট্যের অনেকগুলো দিক রয়েছে। ১৮ বছরের কম বয়সী সকলের অর্থাৎ শিশুদের ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য। লিঙ্গ (জেন্ডার), অর্থনৈতিক অবস্থা, রাজনৈতিক অবস্থান, জাতিগত উৎপত্তি ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য সকল শিশুর ক্ষেত্রে এ সনদ প্রযোজ্য। এখানে শিশুদেরকে বিভিন্ন বয়স স্তরে (১৮ বছরের অনেক নিচে) কতিপয় নীতি ও বিধির অধীনে বিশেষ কিছু সুরক্ষা ও সুযোগ সুবিধা দেয়া হয়ে থাকে। যেমন ১৮ বছরের নিচে মেয়েরা বিয়ে করতে পারে না। ২১ বছরের নিচে ছেলেরা বিয়ে করতে পারে না।

CEDAW সনদে বিবাহ ও পারিবারিক আইন সম্পর্কে বলা আছে যে, শিশুকালে বাগদান ও শিশু বিবাহের কোন আইনগত কার্যকারিতা থাকে না এবং বিবাহের একটি সর্বনিম্ন বয়স নির্ধারণ ও সরকারি বিবাহ অফিসে বিবাহ রেজিষ্ট্রিভুক্ত করা বাধ্যতামূলক করার জন্য আইন প্রণয়নসহ প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিতে বলা আছে মেয়ে শিশুর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্যের বিলোপ সাধন এবং সেই লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নতুন আইন প্রণয়ন করা; বিধান রয়েছে

বাল্যবিবাহ, মেয়ে শিশু ধর্ষণ, নিপীড়ন ও পতিতাবৃত্তির বিরুদ্ধে আইনের কঠোর প্রয়োগ করার।

বাল্যবিবাহের কারণ এবং প্রভাব

দারিদ্র বাল্যবিবাহের অন্যতম একটি কারণ। দারিদ্র চরম আকার ধারণ করলে একটি অল্পবয়সী মেয়ে পরিবারের বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। এ অবস্থায় তাকে তার চেয়ে বয়সে অনেক বড় এমনকি একজন বৃদ্ধের সঙ্গেও বিয়ে দেয়া হয়। দারিদ্র মোকাবেলার একটি কৌশল হিসাবে বয়সের ব্যবধানমূলক এ রীতি একজন বয়স্ক স্বামীকে কম বয়সী একজন স্ত্রীর উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে ও তার রক্ষণশীল সাংস্কৃতিক ধারা বজায় রাখতেও সহায়ক ভূমিকা পালন করে। বাল্যবিবাহের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয় একজন স্ত্রীর 'নিরাপত্তা' ও তার স্বামীর কাছে তার অধীনস্ততা। দারিদ্র দু'ভাবে বাল্যবিবাহকে প্রভাবিত করতে পারে ঃ প্রথমত, অর্থনৈতিক কারণে দরিদ্র পিতামাতা তার মেয়েকে দ্রুত বিয়ে দিয়ে দায়মুক্ত হতে চায়। দ্বিতীয়ত, ছেলের পিতামাতা ছেলেকে বিয়ে দিয়ে কন্যার পিতার কাছ থেকে যৌতুক নিয়ে তাদের পরিবারে স্বাচ্ছন্দ আনতে চায়। বাল্যবিবাহ সম্পর্কিত একটি গবেষণায় বাল্যবিবাহের কারণ সম্পর্কে বলা হয়, "Some of the fundamental factors which lead to fostering child marriage in Bangladesh are extreme poverty, illiteracy, unawareness of parents about the consequences of early marriage, non implementation of child marriage preventive laws, eagerness of grandparents to see their grandson's wife during their lifetime and aspiration for getting dowry.

তাছাড়া, বিবাহপূর্ব যৌন সম্পর্ক প্রতিরোধ অল্প বয়সে মেয়েদের বিয়ে দেয়ার অন্যতম কারণ। বিবাহের ক্ষেত্রে কুমারীত্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে বিবেচিত যার ফলে অননুমোদিত যৌন ক্রিয়া থেকে রক্ষা করার জন্য বাবা-মার দৃষ্টিতে বিয়ে হল নিরাপত্তা বিধানের চূড়ান্ত ব্যবস্থা। কিশোরী মেয়েদের স্বাধীন ব্যক্তিত্ববোধ গড়ে ওঠার বিষটি কোন কোন সমাজে বাঞ্ছনীয় নয়। তাদেরেকে পিতা, স্বামী বা পুত্রের অধীনস্ত হয়ে থাকতে হয় এবং এতে তাদের সুরক্ষা নিশ্চিত থাকবে বলে ধারণা করা হয়। অশিক্ষা অজ্ঞানতার বন্ধনে জড়ানো আমাদের গ্রামীণ সমাজে বিশেষ করে মহিলারা বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে সচেতন নয়। এমনকি সচেতন নয় অনেক শিক্ষিত মেয়েরাও। গ্রামের অল্প শিক্ষিত মেয়েরা এর কুফল জানলেও তারা অনেক সময় মা-বাবার অবাধ্য হতে চায় না। আবার অনেক সময় মা-বাবারা বাল্যবিবাহ না চাইলেও মেয়ের ইচ্ছায় (প্রেমঘটিত) বাধ্য হয় তাকে বিয়ে দিতে।

বাল্যবিবাহের প্রভাব

২০০২ সনে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘ শিশু সম্মেলনে বিশেষজ্ঞরা জানান সারা বিশ্বে ১০-১৭ বছর বয়সী আট কোটি মেয়ে বিবাহিত। দেখা গেছে প্রায় ক্ষেত্রেই তারা শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যগত বিপর্যয়ের শিকার হয়ে পড়ে।

Babies born to adolescent girls, aside from being at risk themselves, cause extra health risks for their mothers. Girls under 19 are twice as to likely to die from complications in child birth as women in their twenties; and girls under 15 are at still greater risk. [৫]

মাতৃমৃত্যুর সম্ভাবনা

বাংলাদেশে মাতৃমৃত্যুর উচ্চ অনুপাতের জন্য দায়ী মূল কারণগুলো হচ্ছে অল্প বয়সে বিয়ে করা এবং অল্প বয়সে সন্তান ধারণ। যদিও বিগত বছরে প্রথম বিয়ের গড় বয়স বৃদ্ধি পেয়েছে তথাপি গ্রামাঞ্চলের মহিলাদের একটি বিরাট অংশ এখনও অল্প বয়সে বিয়ে ও গর্ভধারণের ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।

সন	বয়স	উর্বরতার হার (প্রতি হাজারে)
১৯৯৩	১৫-১৯	১৪০
১৯৯৬	১৫-১৯	১৪৭
১৯৯৯	১৫-১৯	১৪৪

উৎস ঃ ডেমোগ্রাফিক এবং হেলথ সার্ভে, বি.বি.এস.

বাল্যবিবাহের ফলে প্রায় ক্ষেত্রেই উপযুক্ত সময়ের আগে মেয়েরা গর্ভধারণ করে। ১৯৯৬ সালের সরকারি হিসাবে দেখা যায় মেয়েদের গড় বয়স ২০ অর্থাৎ ২০ বছরের আগেই অর্ধেক মেয়ের বিয়ে হয়ে যায়।[৬] তবে প্রকৃত গড় বয়স এর চেয়েও কম হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। সম্ভবত ১৮ এর কাছাকাছি। আরও দেখা গেছে যে ২০% মেয়েই ১৫ বছরের মধ্যে মা হয়ে যায়।[৭] বাংলাদেশের মতলব থানায় মাতৃমৃত্যুর কারণসমূহের উপর ১৯৭৬-৮৫ সালে পরিচালিত এক সমীক্ষার বিশ্লেষণে দেখা যায় ১৫-১৯ বছরের মেয়েদের মধ্যে মাতৃত্বের হার ২০-৩৪ বছর বয়সী (কম ঝুঁকির বয়স) নারীদের মাতৃ মৃত্যুর হারের চেয়ে অনেক বেশি।[৮]

বাল্যবিবাহ ও অকাল গর্ভধারণের ফলে কিশোরী মা ও তার সন্তান উভয়ই ঝুঁকির সম্মুখীন হয় যেমন-

* সন্তান প্রসবে জটিলতা, *কম ওজনের সন্তান জন্ম দেয়া, *সদ্যজাত শিশুর না বাঁচার সমূহ সম্ভাবনা

* স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও বিকাশের সমস্যা

শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত

যে সকল শিশু বাল্যবিবাহের শিকার বিশেষ করে বিদ্যালয়ে যাবার বয়সী শিশুদের শিক্ষার অধিকার ও সুযোগ নষ্ট করে। এতে তাদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং বয়ঃপ্রাপ্তির জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ সম্ভব হয় না। বিভিন্ন সমীক্ষা থেকে দেখা যায় যে, একটি মেয়ের বিদ্যালয়ে যাওয়ার সাথে তার বিয়ে বিলম্বিত হওয়া পরস্পর সম্পর্কিত।

সহিংসতা ও স্বামী কর্তৃক পরিত্যাগ

বাংলাদেশে দাম্পত্য সহিংসতা সামাজিকভাবে অপরাধ হিসাবে বিবেচিত হয় না। এর ফলে নারীদের নিরাপত্তার প্রতি এটি সবচেয়ে বড় হুমকি। কিশোরী বধুদের এক বিরাট অংশ স্বামী কর্তৃক প্রহৃত হয়।

যৌনবাহিত রোগ

বাল্যবিবাহে আবদ্ধ খুব কম সংখ্যক মেয়েই গর্ভনিরোধক ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ পায়। বিয়ের অব্যবহিত পরেই সন্তান গর্ভধারণ সামাজিক মর্যাদার অংশ। প্রাপ্তবয়স্ক নারীদের চেয়ে কিশোরী মেয়েদের HIV/এইডস ভাইরাস সহ বিভিন্ন যৌনবাহিত রোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা বেশি থাকে। শারীরিক কারণ ছাড়াও নারী-পুরুষ সম্পর্কে পুরুষের কর্তৃত্ব এর জন্য প্রধানত দায়ী।

মনোঃ সামাজিক সমস্যা

বাল্যবিবাহ কৈশরের সমাপ্তি ঘটায়। জোরপূর্বক যৌন সম্পর্কে বাধ্য করে। স্বাধীনতা খর্ব করে। ব্যক্তিসত্বার বিকাশ ব্যাহত করে যা কিশোরীদের মনোঃ সামাজিক ও আবেগের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

মাঠ পর্যায়ে সমীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণ

নিম্ন আয়ভুক্ত পরিবারগুলোতেই বাল্যবিবাহের প্রবণতা বেশি দৃষ্টিগোচর হয়। তবে মধ্যবিত্ত বা নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারেও বাল্যবিবাহের ব্যাপারটি লক্ষণীয়। গবেষণায় উত্তরদাত্রী ও পরিবারের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থাও বিশ্লেষণ করা হয়। লক্ষনীয় যে, নিম্ন আয়, শিক্ষার স্বল্পতা এবং বাল্যবিবাহের প্রভাব সম্পর্কে উদাসীনতা বা অসচেতনতাই এর জন্য দায়ী বলে ধরে নেয় হয়।

টেবিল-১ ঃ পরিবার প্রধানের শিক্ষাগত যোগ্যতা

শিক্ষাগত যোগ্যতা	পুরুষ	মহিলা	মোট	%
অশিক্ষিত	৪৭	৫৩	১০০	৬১.৭
১ম- ৫ম শ্রেণী	২৫	১৩	৩৮	২৩.৫
৬ষ্ঠ- ১০ম শ্রেণী	১০	০৭	১৭	১০.৫
এস.এস.সি	০৩	০১	০৪	২.৪
এইচ.এস.সি	০২	০০	০২	১.২
ডিগ্রী	০০	০১	০১	০.৭
মাস্টার্স	০০	০০	০০	০.০

টেবিল-২ ঃ পরিবার প্রধানের আয়

আয়	পরিবারের সংখ্যা	%
১০০০ টাকার নিচে	৩০	১৮.৫
১০০১-২০০০	৪৮	২৯.৬
২০০১-৩০০০	৩৫	২১.৬
৩০০১-৪০০০	১৯	১১.৭
৪০০১-৫০০০	১২	৭.৪
৫০০১-৬০০০	০৯	৫.৬
৬০০১-৭০০০	০৮	৪.৯
৭০০১-উপরে	০১	০.৭
মোট	১৬২	

টেবিল-৩ ঃ বিবাহ সংঘঠিত হবার বয়স (মহিলা/পুরুষ)

বয়স	বিবাহিত মহিলার সংখ্যা	%	বিবাহিত পুরুষের সংখ্যা	%
৫-৯	৩	১.৯	০০	০.০
১০-১৫	১০৪	৬৬.২	৩৫	২৪.৫
১৬-২০	৪০	২৫.৫	৬০	৪২
২১-২৫	০৫	৩.২	৩০	২১
২৬-৩০	০৪	২.৬	১৪	৯.৮
৩১ বৎসরের উপরে	১	০.৭	৪	২.৭
মোট	১৫৭		১৪৩	

টেবিল-৪ ঃ পত্রবধুর বয়স (বিবাহকালীন)

বয়স	সংখ্যা	%
৭-১০	০৪	৩.৯
১১-১৫	৭২	৬৯.৯
১৬-২০	১৮	১৭.৫
২১-২৫	০৭	৬.৮
২৬-৩০	০২	১.৯
মোট	১০৩	

টেবিল-৫ ঃ বিবাহ রেজিস্ট্রেশন

ধরণ	সংখ্যা	%
রেজিস্ট্রিকৃত বিবাহ	২৫	২৩.৮
রেজিস্ট্রি হয়নি	৭০	৬৬.৭
রেজিস্ট্রেশন সম্পর্কে অসচেতন	১০	৯.৫
মোট	১০৫	

টেবিল-৬ ঃ বিবাহ সংঘটিত হবার সময় পাত্র-পাত্রীর মতামত গ্রহণ

	হ্যাঁ	না
পাত্র	৬৫	৫৫
পাত্রী	৬০	৬৫

টেবিল-৭ ঃ বাল্যবিবাহ জটিলতা

অবস্থা	হ্যাঁ	%	না	%	মোট
স্বামী/পরিবারের সাথে (maladjustment) বনিবনা না হওয়া	৪৪	৪৪.৯	৫৪	৫৫.১	৯৮
স্বামীর বহুগামিতা (polygamy)	১০	১০.২	৮৮	৮৯.৮	৯৮
যৌতুকের শিকার	৭৫	৭৫.৭৫	২৪	২৪.২৫	৯৯
গর্ভপাত (abortion)	১০	৯.৮	৯২	৯০.২	১০২
স্বাস্থ্য অবনতি (মহিলাদের ক্ষেত্রে)	৭০	৭৩.৭	২৫	২৬.৩	৯৫

টেবিল ১-এ দেখা যাচ্ছে যে, পরিবারের প্রধানেরা বেশিরভাগই হচ্ছে অশিক্ষিত। মোট ১৬২ জনের মধ্যে ১০০ জনই এ শ্রেণীর অন্তর্গত প্রায় (৬১.৭%) এবং ২৩.৫% পুরুষ ও মহিলা ১ম শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করেছে। অশিক্ষিত, অল্পশিক্ষিত জনগোষ্ঠী তাদের শিক্ষার স্বল্পতার কারণে বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে সচেতন নয়। বেশিরভাগ বিবাহিত পুরুষ ও মহিলা হচ্ছে অশিক্ষিত এবং উত্তরদাতা পরিবারের মাসিক আয় অধিকাংশ পরিবারেরই ১০০০ থেকে ৪০০০ এর মধ্যে সীমাবদ্ধ। টেবিল ২ লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে ১৬২টি পরিবারের মধ্যে ৪৮টি পরিবারের আয় ১০০১-২০০০ এর মধ্যে (২৯.৬%) এবং ১৮.৫% এর আয় ১০০০ টাকার নিচে। মাত্র ৪.৯% এর আয় ৬০০০ টাকা বা তদুর্ধে। যদিও গবেষণাটি করার ক্ষেত্রে নিম্ন আয়ভুক্ত পরিবারগুলোকেই বেছে নেয়া হয়েছিল। নিম্ন আয় তাদের জীবনযাত্রার নিম্ন মানের জন্য দায়ী। নিম্ন আয়ের ফলে তারা তাদের ছেলেমেয়েদের অল্প বয়সে বিয়ে দিতে বাধ্য হয়। টেবিল ৩-এ দেখা যাবে যে ১৫৭টি বিবাহের মধ্যে ১০৪ জন মহিলারই ১০-১৫ বছরের মধ্যে বিবাহ হয়েছে যার শতকরা হার ৬৬.২%। ১৬-২০ বৎসর বয়সের মধ্যে বিবাহ হয়েছে ৪০ জন মহিলার (২৫.৫%)। অপরদিকে ১০-১৫ বছর বয়সের মধ্যে বিবাহ সংঘটিত হয়েছে এমন পুরুষের সংখ্যা ৩৫ জন (প্রায় ২৪.৫%)। টেবিল ৩-এ আমরা বাল্যবিবাহের ব্যাপকতা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাই যা মূলত সমগ্র বাংলাদেশের গ্রামগুলোরই প্রতিনিধিত্ব করে। গবেষণা এলাকার দু'টি গ্রামেই কমপক্ষে ১৮ বছরের নিচে হলে বিয়ে দেয়া নিষেধ সত্বেও তা লঙ্ঘন করা হচ্ছে। এসকল বিবাহের অধিকাংশই রেজিস্ট্রিভুক্ত হচ্ছে না। টেবিল ৫-এ দেখা যাচ্ছে ১০৫টি বিবাহের মধ্যে ৭০টি বিবাহেরই রেজিস্ট্রেশন হয়নি যার শতকরা হার ৬৬.৭%। ৯.৫% জানেই না বিবাহ রেজিষ্ট্রেশন সম্পর্কে। ফলে বিবাহ পরবর্তী বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টি হয়। বিবাহের পূর্বে ১২০ জনের মধ্যে ৬৫ জন ছেলের কাছ থেকে তার পিতামাতা বিবাহ সম্পর্কে আলোচনা করেছে এবং মতামত নিয়েছে এবং ৫৫ জনের কাজ থেকে মতামত চাওয়া হয়নি। মেয়েদের ক্ষেত্রে ১২৫ জনের মধ্যে ৬০ জনের কাছ থেকে পিতামাতা কর্তৃক পাত্রী/কন্যার মতামত নেওয়া হয়েছে (টেবিল-৬)। পিতামাতা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মনে করে যে বিবাহের ব্যাপারে পুত্র/কন্যার মতামত নেয়া সমীচীন নয়। পিতামাতা বিষয়টিকে তাদের একান্ত নিজের দায়িত্ব বলে মনে করে এবং সাথে সাথে এও বিশ্বাস করে যে তাদের অর্থাৎ পুত্র/কন্যার পক্ষে বিবাহ সম্পর্কে সুচিন্তিত মতামত দেয়া সম্ভবপর নয়। বাল্যবিবাহ ও বিবাহ রেজিস্ট্রেশন না হওয়ার ফলে পরবর্তী যে জটিলতা হতে পারে বা সৃষ্টি হয় সে সম্পর্কে টেবিল ৭-এ লক্ষ্য করলে বুঝা যায়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বিবাহের পর স্বামী বা তার পরিবারের সাথে বনিবনা হচ্ছে না। বিবাহের জন্য শারীরিক বা মানসিক দিক থেকে পূর্ণ না হওয়ায় বা প্রস্তুতি না থাকায় মেয়েদের স্বাস্থ্যহানী দেখা যায় এবং গর্ভপাত ঘটে। মেয়েদের স্বাস্থ্যের

অবনতি বা শ্রীহানী ঘটার ফলে স্বামীদের অন্যত্র বিবাহ করার বা বহু বিবাহ করার প্রবণতা দেখা দেয়।

বাল্যবিবাহ নিরসনে আইনগত জটিলতা

অনেক দেশে বাল্যবিবাহ প্রথা প্রচলিত দেওয়ানী ও সাধারণ আইনে নিষিদ্ধ হলেও প্রচলিত প্রথা, ধর্মীয় আইন ও রীতিনীতি তা অনুমোদন করে। এটি সাধারণত পরিলক্ষিত হয় সেখানে, যেথায় বিয়ে প্রথা অনুযায়ী হয় এবং রেজিস্ট্রেশন হয় না।

বাংলাদেশে ১৯২৯ সালের বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন অনুযায়ী ১৮ বছরের নিচে কোন মেয়ে এবং ২১ বছরের নিচে কোন ছেলে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে না। তবে এ আইন নামমাত্র। বাংলাদেশের নারীর অর্ধেকই ১৮ বছরের নিচে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়।[৩]

১৯২৯ সালের বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনের বিধান লজ্ঘন করে ১৮ বছরের নিম্ন বয়স্ক কোন মেয়েকে বিয়ে করলে সে বিয়ে বাতিল হবে না। যদিও প্রাপ্ত বয়স্ক স্বামী বা অন্য কেউ বিয়ে অনুষ্ঠানের জন্য ফৌজদারী আইনে দায়ী হতে পারেন। বাল্যবিবাহ পরিচালনা ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। যদি কেউ দাবী করে বিয়েটি বাল্যবিবাহ ছিলনা, তবে যে ব্যক্তি এরূপ দাবী করবে তাকেই প্রমাণ করতে হবে যে বিয়েটি বাল্যবিবাহ ছিলনা মর্মে বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ ছিল। কোন ব্যক্তি বাল্যবিবাহ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা বা পরিচালনা করলে যদি সে প্রমাণ করতে না পারে যে বিয়েটি বাল্যাববাহ ছিল না বলে বিশ্বাস করার মত কারণ ছিল, তবে সে ব্যক্তি একমাস পর্যন্ত বা যে কোন মেয়াদের বিনাশ্রম কারাদণ্ড বা এক হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা উভয়বিধ দন্ডে দন্ডিত হবেন।

১৮৯৮ সালে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৯০ ধারার বিধান সত্বেও প্রথম শ্রেণীর মেজিস্ট্রেট ছাড়া অন্য কোন আদালত বা মেজিস্ট্রেট বাল্যবিবাহ সংক্রান্ত কোন অপরাধ আমলে নিতে বা বিচার করতে পারেন না। কোন আদালত বাল্যবিবাহ সংক্রান্ত কোন অপরাধ কেবল সংশ্লিষ্ট এলাকার ইউনিয়ন পরিষদ বা পৌরসভা বা পৌরকর্পোরেশন অথবা সরকার কর্তৃক নির্দেশিত কোন কর্তৃপক্ষের দায়েরকৃত কোন অভিযোগ ছাড়া বিচার করবেন না এবং এ বিষয়ে অভিযোগটি অবশ্যই অপরাধ সংঘটনের তারিখ হতে এক বছরের মধ্যে করতে হবে। যদি আদালত কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারী করে এবং তা জ্ঞাত হওয়া সত্বেও সে ব্যক্তি তা অমান্য করেন তবে তিনি তিন মাস পর্যন্ত সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদন্ড অথবা এক হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা উভয়দন্ডে দন্ডযোগ্য হবেন। শর্ত হচ্ছে কোন মহিলাকে কারাদন্ডে দন্ডিত করা যাবে না।[৪]

বিভিন্ন নীতি, সংবিধি ও ধর্মীয় আইনে দেয়া শিশুদের বয়স ভিত্তিক সংজ্ঞার সাথে সনদের সংজ্ঞার অসামঞ্জস্য রয়েছে। যেমন, ধর্মীয় আইনের ক্ষেত্রে বয়ঃসন্ধি লাভের পর থেকেই অর্থাৎ মেয়েদের ১২ বছর ও ছেলেদের ১৫ বছর বয়সে শৈশবের সমাপ্তি ঘটে। আরেকটি বিষয় হচ্ছে বাংলাদেশের প্রচলিত সাধারণ সাস্কৃতিক ধারণা যে ১৮ বছরের অনেক আগেই শৈশবের সমাপ্তি ঘটে। একটি মেয়ের ঋতুস্রাব শুরু হলে সে গর্ভে সন্তান ধারণ করতে পারে। আর তাই তাকে মনে করা হয় একজন প্রাপ্তবয়স্ক নারী। এ ধারণাটি জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। কেননা সনদে ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত সকলকে শিশু বলা হয়েছে এবং শৈশবকে বিকাশের একটি প্রক্রিয়া হিসাবে ধরা হয়েছে। কিন্তু এ বিকাশ সাধন কোন শারীরিক পরিপক্কতার চিহ্ন দ্বারা পরিমাপ করা যায় না।

মুসলিম বিবাহ আইন ১৯৭৪-এর আওতায় সমস্ত বিবাহ নিবন্ধনের মাধ্যমে সম্পন্ন হতে হবে। এ আইন দৃশ্যত কার্যকরী হলেও এর প্রয়োগ সম্পূর্ণভাবে হয়নি। বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ১৯২৯ এখনও এদেশে বলবৎ আছে; কিন্তু এ আইনের সফল প্রয়োগ দেখা যায় না। এর কারণ হিসাবে বলা যায়-

ক) এখন বাল্যবিবাহ হচ্ছে কিন্তু তা কোন রকম রেজিস্ট্রশন ছাড়াই। ১৯৯৮ সালে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ও ইউনিসেফ- বাংলাদেশ পরিচালিত দুইটি সীমিত আকারের জরীপে দেখা যায়, আমাদের দেশে প্রায় ৪০ শতাংশ বিয়ে রেজিস্ট্রি হয় না। এর কারণ হিসাবে জরীপের রিপোর্টে তিনটি বিয়ষ উল্লেখ করা হয় ঃ

এক-রেজিস্ট্রেশনের সুফল ও প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে সচেতনতার অভাব;

দুই-রেজিস্ট্রেশনের পদ্ধতি ও এ সংক্রান্ত বিদ্যমান আইন সম্পর্কে সচেতনতার অভাব; এবং

তিন-রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে নারীর অবস্থান দৃঢ় করার ব্যাপারে আগ্রহের অভাব।

বিয়ে সম্পর্কিত সকল তথ্য সরকারি রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করাই হচ্ছে বিবাহ রেজিস্ট্রেশন। রেজিস্ট্রেশনের কপি হচ্ছে আইনগতভাবে বিয়ের প্রমাণপত্র। বিয়ের রেজিস্ট্রিপত্রে বর-কনের স্বাক্ষর, বিয়ের স্বাক্ষীদের স্বাক্ষর, কাজী বা যিনি বিয়ে পড়িয়েছেন তার স্বাক্ষর ও রেজিস্ট্রি অফিসের সিল ও রেজিস্ট্রারের স্বাক্ষর থাকতে হবে। মুসলিম বিবাহ ও তালাক রেজিস্ট্রেশন আইন (১৯৭৪) ধারা ৫(২) অনুযায়ী অবশ্যই প্রতিটি বিয়ে ও তালাক রেজিস্ট্রি করতে হবে। বিয়ে রেজিস্ট্রেশন না করা একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। কিন্তু ধর্মীয়ভাবে কাজী বা হুজুরের পরিচালনায়

সাক্ষীদের উপস্থিতিতে মৌখিক চুক্তি হলেও মুসলিম বিয়ে বৈধ বলে স্বীকৃত। তাই বিবাহ রেজিস্ট্রেশন আইন বলবৎ থাকা সত্ত্বেও অনেক বিয়েই রেজিস্ট্রি করা হয় না। হিন্দু পারিবারিক আইনে বিবাহ রেজিস্ট্রেশনের কোন বিধান নাই।বৌদ্ধদের ক্ষেত্রেও তাই। এ কারণে বাংলাদেশে হিন্দু ও বৌদ্ধদের বিয়ে রেজিস্ট্রেশন হয় না। যদি কখনও বিয়ে প্রমাণের প্রয়োজন হয় তবে নোটোরাইজেশনের মাধ্যমে তা করা হয়।

(খ) যখন এমন বিয়ে হচ্ছে তখন মেয়ের বয়সের পরিপূর্ণতার স্বপক্ষে মিথ্যা দলিল দাখিল হচ্ছে।

বাল্যবিবাহ আইনটি স্ববিরোধী এ অর্থে যে একদিকে অপরিণত বিবাহকে অস্বীকৃতি জানানো হয়েছে, অন্যদিকে যদি রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে এ বিয়ে সংঘটিত হয়ে যায় তাহলে এ বিয়েকে বাঁচিয়ে রাখার কথাও বলা হয়েছে। বাল্যবিবাহ আইনে যিনি এ বিবাহ পরিচালনা করেন তার বিরুদ্ধে যেমন শাস্তির বিধান রয়েছে তেমনি শাস্তির বিধান রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে যারা এ বিয়ের ব্যবস্থা বা আয়োজন করেছেন। প্রচলিত ব্যবস্থায় উভয় পক্ষের সম্মতিতে বিয়ে হলে এ আইনের আওতায় কোন অভিযোগই আনা হয় না।

সুপারিশ

বাল্যবিবাহ ও তার কুপ্রভাবকে দূর করার জন্য সঠিক নীতিমালা প্রণয়ন ও ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা প্রয়োজন। এর উপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণে এবং বাল্যবিবাহ নিরসনে সরকার এবং সুশীল সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে এবং এ লক্ষ্যে কিশোর-কিশোরী, নারী-পুরুষ, সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, নীতি নির্ধারকমন্ডলী, শিক্ষাবিদ, গবেষক, আইনজীবী সবার মাধ্যমে জাতীয়, আন্তর্জাতিক, বেসরকারি ও আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন পেশাজীবী ও কর্মীদের সক্রিয়ভাবে জড়িত করতে হবে।

১) **গণসচেতনতা ঃ** নিম্নোক্ত বার্তা প্রদানের মাধ্যমে অল্প বয়সে মেয়েদের বিবাহ রোধের এবং ২০ বছর বয়সের আগে সন্তান না নেয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে।

- মাসিক হলেই মেয়েরা সন্তান ধারণের উপযুক্ত হয় না।
- যে মেয়ের শরীর সম্পূর্ণভাবে গঠিত হয়নি তার প্রসব বাধাগ্রস্ত হতে পারে; ফলে মা ও সন্তান দুজনেরই মৃত্যুর ঝুঁকি থাকে।
- অল্প বয়সে বিয়ে রোধ করার জন্য মেয়েদের স্কুলে ধরে রাখা এবং মানুষকে তথ্য অবহিতকরণের কার্যক্রম হাতে নিতে হবে।

- যৌনস্বাস্থ্য বিষয়ে বাস্তবধর্মী শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। বিবাহিত ও অবিবাহিত মেয়েদের কাছে প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শ সেবা পৌঁছে দিতে হবে।

২) **অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঃ** কিশোরী মেয়েদের জন্য কিছু কর্মসূচি নিতে হবে যাতে তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হয়। এ ধরনের কর্মসূচির মধ্যে দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ ও শ্রম বাজারে কিশোরীদের কর্মসংস্থানে সহায়তা করার ব্যবস্থা অত্যন্ত জরুরি।

৩) **আইন সংশোধন ঃ** নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে সরকারি ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন-

ক) আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানবাধিকারের মানদন্ডের আলোকে বিয়ে সংক্রান্ত প্রচলিত ও দেওয়ানী আইন সংশোধন।

খ) জন্ম ও বিবাহ রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত বিদ্যমান আইনের প্রয়োগ। "রেজিস্ট্রিহীন বিয়ে বন্ধে যে আইন ও শাস্তি তা খুব দুর্বল। এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে ধাক্কা দিলে বা গালি দিলেই তিন মাসের কারাদন্ড হয়। আর সে তুলনায় এক্ষেত্রে শাস্তির মাত্রা খুবই নগণ্য।" ১৯৭৪ সালের বিবাহ ও তালাক রেজিস্ট্রেশন এ্যাক্ট কার্যকর করতে শাস্তির মাত্রা আরও বাড়ানো উচিত।

গ) পুলিশ, ধর্মীয় প্রতিনিধি, আইন প্রণেতা ও বিবাহ রেজিস্ট্রেশনকারীদের যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান।

ঘ) মসজিদের ইমামদের এ লক্ষ্যে অর্থাৎ বাল্যবিবাহ রোধে এবং এর কুফল সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করার জন্য যথাযথ প্রশিক্ষণ দিয়ে কাজে লাগানো যেতে পারে।

উপসংহার

একটি গ্রামের উপর প্রাপ্ত তথ্যকে বিশ্লেষণের মাধ্যমে বাল্যবিবাহের যে স্বরূপ উদঘাটিত হয়েছে তা বাংলাদেশের বেশিরভাগ গ্রাম বা ইউনিয়নের ক্ষেত্রেই কমবেশি প্রযোজ্য। তবে এর ব্যতিক্রম যে কোন গ্রামেই নেই তা বলা যাবে না। তবে বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে অবগত করার জন্য বিভিন্ন সেমিনার, মাঠকর্মীদের দায়িত্ব দেয়া এবং সমাজের শিক্ষিত শ্রেণীদের এবং টেলিভিশন ও বেতারকে কাজে লাগানো যেতে পারে। বাল্যবিবাহ সমাজের জন্য অভিশাপ এবং বিশেষ করে মহিলাদের উপর এর নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে। স্থানীয় সরকারগুলোকে যদি যথাযথ ক্ষমতা প্রদান করা হয় তবে বাল্যবিবাহ কমাতে এ প্রতিষ্ঠানগুলো কার্যকরী ভূমিকা

পালন করতে পারে। তাছাড়াও ধর্মীয় নেতা (বিশেষ করে ইমামদের) সাহায্য নেয়া যেতে পারে। বাল্যবিবাহের অপকারীতা সম্পর্কে সচেতন করার জন্য তাদের ভূমিকাকে কাজে লাগাতে হবে। জন্ম ও বিবাহ রেজিস্ট্রেশন আইন অবশ্যই সফলভাবে প্রয়োগ করতে হবে। বিয়ে সম্পর্কে আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের জন্য সমাজের সকল স্তরে বিশেষ করে পরিবারে এবং কমিউনিটিতে ব্যাপক প্রচারণা প্রয়োজন। বিয়েকে সাধারণত একটি ব্যক্তিগত এমনকি সংবেদনশীল বিষয় হিসাবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। বাল্যবিবাহ বন্ধ করার লক্ষ্যে এ ধরনের মনোভাব পরিবর্তন করার জন্য (বিশেষ করে রক্ষণশীল গ্রামীণ সমাজ ও জাতিগোষ্ঠীতে যেখানে বাল্যবিবাহের প্রচলন বেশি) উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

তথ্য নির্দেশিকা

১। বাল্যবিবাহ-শিশুর মৌলিক অধিকার লজ্মন, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরবার, সেপ্টেম্বর, ২০০১, পাতা-৯।

২। Uddin, M. Gias & Selim, M. (2000), An Agony into the Nature & Connsensus of Child Marriage in Bangladesh, Journal of Bangladesh Society, IMIT, Page-93

৩। United Nations (1991), The World's Women- Trends and Statistics, 1970-90, New York.

৪। Uddin, পূর্বোক্ত, পাতা-৯২।

৫। বাল্যবিবাহ, পূর্বোক্ত, পাতা-১১।

৬। United Nations, পূর্বোক্ত, পাতা-১০।

৭। স্যাম্পল ভাইটাল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম (১৯৯৬ সনের সংখ্যা সাময়িকি)

৮। সার্ক মেয়ে শিশু কর্মপরিকল্পনা ১৯৯১-২০০০, বাংলাদেশ সরকার, ১৯৯৬।

৯। বাল্যবিবাহ, পূর্বোক্ত, পাতা-১৫।

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা,
সপ্তম বর্ষ সংখ্যা কার্তিক ১৪০৯

বাংলাদেশের লবণাক্ত অঞ্চলের কৃষি : অতীত ও বর্তমান

মল্লিক আনোয়ার হোসেন*

Agriculture of Saline Zones in Bangladesh: Past and present

Mollick Anwar Hossain

Abstract : Agriculture is the main occupation of the saline zones of Bangladesh. Majority of the population in saline zones are still engaged in agriculture. Shrimp culture was introduced in late seventies in the saline zones and is gradually getting important for its increasing foreign exchange earning. Unplanned and unscientific shrimp cultivations have drastically reduced the stock of indigenous crop and fish varieties. The shrimp culture also affects green vegetation and ecosystem that causes destruction of natural resources. Horticultural crop like coconut, betelnut, banana, etc., which are indigenous to the saline areas, are totally damaged for increasing salinity. Saline water is essential for shrimp cultivation but it is harmful for crop cultivation. So, farmers who constitute the majority of the farming do not have access to crop cultivation due to the high level of salinity. Without crop productions, farmers in saline zones become poorer. As a result, they sell their lands to the owners of shrimp farms. So shrimp culture results in serious social and ecological problems in saline regions. In the following article the past and present agricultural system of saline zones in Bangladesh has been compared. At the same time, it will have some suggestions to overcome problems.

ভূমিকা

কৃষির সাথে এ দেশের মানুষের অনন্তকালের সম্পর্ক । স্বাধীনতার পর দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে নতুন নতুন ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়েছে তবুও কৃষিকে অতিক্রম করা সম্ভব হয়নি। বর্তমানে জিডিপিতে কৃষির অবদান প্রায় ২৫ ভাগ (BBS, 2000)। সত্তর দশকের তুলনায় বর্তমান কৃষিতে উন্নততর প্রযুক্তি যুক্ত হয়েছে । কৃষিবিজ্ঞানীগণ অক্লান্ত পরিশ্রম করে ধানসহ বিভিন্ন ফসলের নতুন নতুন জাত উদ্ভাবন করেছেন । মাঠ ফসল ও আঙ্গিনা ফসলের চাষ ও ফলন দুই থেকে তিন গুণ বেড়েছে । সাথে সাথে মানুষও বেড়েছে ব্যাপক হারে । বর্ধিত মানুষের

---

* উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।

বাসস্থানের সংকুলান করতে যেয়ে কমেছে কৃষি জমির পরিমাণ। আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে কৃষি জমির উপর চাপ পড়েছে । একদিকে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ কমেছে, অন্যদিকে মানুষ বেড়েছে তাই বর্ধিত ফসলের হিসেব সহজে আমাদের চোখে পড়ে না । ফসলের নতুন জাত ও উন্নততর প্রযুক্তি উদ্ভাবনের ফলে দেশের অধিকাংশ এলাকার কৃষকের মুখে হাসি ফুটেছে । কিন্তু এ হাসি হতে বঞ্চিত হচ্ছে লবণাক্ত অঞ্চলের কৃষক ও তাদের পরিবার পরিজন । কারণ আজও বৈজ্ঞানিকগণ এ দেশের আবহাওয়া উপযোগী করে লবণ সহিষ্ণু (Salt tolerant) কোন ফসলের উন্নত জাত (variety) উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয়নি । গবেষণা এগিয়ে চলছে, হয়তো একটি লবণ সহিষ্ণু ফসলের নতুন জাতের সৃষ্টি হবে । কিন্তু সেদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করে বর্তমান সময়কে সামাল দেয়া লবণাক্ত অঞ্চলের কৃষকের পক্ষে কষ্টসাধ্য ব্যাপার।

বাংলাদেশের সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলসমূহে লবণ পানির প্রভাব বেশী । সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলের মোট আয়তন ২৮,০০০ বর্গ কিলোমিটার । আমাদের দেশের মোট আয়তনের প্রায় ২০ ভাগ। কোষ্টাল এলাকার মাটিতে বিভিন্ন মাত্রার লবণাক্ততা রয়েছে। লবণের তীব্রতা সবচেয়ে বেশী দেখা যায় খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা জেলায় এবং বরগুনা, পটুয়াখালী, পিরোজপুর, নোয়াখালী, কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম জেলার কিছু অংশে । এ অঞ্চলের কৃষক আদি হতে নিজস্ব কলাকৌশল প্রয়োগ করে কৃষি কাজ করে । সময়ের ধারাবাহিকতায় আবহাওয়া ও প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে কৃষক ফসল উৎপাদন করে। ফসল উৎপাদনের প্রক্রিয়া গতানুগতিক ও পুরাতন ধাচের হলেও উৎপাদিত ফসল দিয়ে এ অঞ্চলের কৃষকগণ অতীতে স্বাচ্ছন্দে দিনাতিপাত করেছেন। লবণাক্ত অঞ্চলে সত্তর দশকে চিংড়ী চাষ শুরু হয় । এ সময় হতে ধীরে ধীরে নিম্ন ও মধ্যবিত্ত কৃষকের ভাগ্যে অন্ধকার নেমে আসে । চিংড়ী চাষের জন্য অপরিহার্য লবণ পানি ফসলের জমিতে প্রবেশ করার ফলে ধীরে ধীরে জমির উর্বরতা ও উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পায় । বিগত দুই দশকে চিংড়ীর আন্তর্জাতিক বাজার মূল্য ক্রমেই বেড়েছে । তাই কৃষকের ফসলের জমিতে তার স্বেচ্ছায় অথবা কৌশলে এক শ্রেণীর মানুষ চিংড়ী চাষ করে কৃষককে দরিদ্র হতে দরিদ্রতর করেছে । মাঠ ফসলের (Field crop) পাশাপাশি আঙ্গিনার সবুজ বৃক্ষরাজিও লবণ পানির বিরূপ প্রভাবে বিলীন হয়ে গেছে । দক্ষিণ অঞ্চলের নারিকেল, সুপারী, খেজুরের গুড় আস্তে আস্তে কৃষকের চোখের আড়ালে চলে গেছে।

লবণাক্ত অঞ্চলে বর্তমানে ফসলের মাঠ শূন্য থাকে প্রায় সারা বছর । চারিদিকে অঁথে পানি আর পানি । বসতবাড়ীর বৃক্ষরাজীও প্রায় আধামরা, কৃষককুলও নিঃস্ব প্রায় । অতীতে লবণ পানি প্রতিরোধ করে এ অঞ্চলের কৃষক ফসল ফলাতো, তাদের আঙ্গিনা ফসলে ভরে থাকতো । বসতবাড়ীতে ছিল প্রচুর নারিকেল, সুপারী ও ফলের গাছ । সময়ের সাথে সাথে

দুই যুগের মধ্যেই দক্ষিণ বাংলার লবণাক্ত অঞ্চলে কৃষি উৎপাদন ব্যাপকভাবে কমে গেছে। অনেক কৃষক নিঃস্ব হয়ে জমা-জমি বিক্রি করে শহরে চলে এসেছে । নিম্ন ও মধ্যবিত্ত কৃষক সংগ্রাম করে বেঁচে আছে । উচ্চবিত্ত ধনী শ্রেণীর কৃষক ফসলের পরিবর্তে চিংড়ী চাষ করে লাভবান হয়েছে । তাই লবণাক্ত অঞ্চলের অতীত ও বর্তমান কৃষির মাঝে অনেক ব্যবধান ।

লবণাক্ত অঞ্চলের অতীত কৃষি

'কৃষি' বলতেই ফসলের কথা মনে হয় । তবে সামগ্রিকভাবে প্রধানতঃ তিনটি ক্ষেত্র হতে কৃষির উৎপাদন হয়ে থাকে। এক**:** বিভিন্ন ফসল দুই**:** পশু সম্পদ তিন**:** মৎস্য সম্পদ । অতীতে দক্ষিণ বাংলার কৃষির ৯০ ভাগই দখল করে ছিল মাঠফসল। এর মধ্যে অন্যতম ছিল আমন ধান । উৎপাদিত ফসল হতে এ অঞ্চলের মানুষের আয় হতো ৭০ ভাগ অর্থ যা বর্তমান সময়ে নেমে এসেছে ৪২ ভাগে (এলাহী, সুবাস এবং সাহিন, ১৯৯৮) । লবণাক্ত এলাকার স্থানীয় আমন ধানের জাতসমূহ অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। এসব স্থানীয় জাতের মধ্যে অন্যতম ছিল রাজাসাইল, কার্তিক বালাম, চাপসাইল, নোনাকচি, সাদামোটা, লালমোটা, ইন্দোনেশিয়া বালাম, জামাইনাড়ু, আরমান সরদার ইত্যাদি । বিঘা প্রতি ধানের ফলন ছিল ১৫-২০ মন । সামান্য চাষেই স্থানীয় জাতের ধানের আবাদ করা যেত। এসব স্থানীয় জাতের ধান কিছুটা লবণ সহিষ্ণু ও রোগ প্রতিরোধী । আমন মৌসুমে জুলাই হতে মধ্য সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ধানের চারা রোপণ করে ডিসেম্বর হতে জানুয়ারীর মধ্যে কৃষকের ঘরে ফসল উঠত। কৃষকের চাহিদা, বুদ্ধিমত্তা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পর্যায়ক্রমে এসব স্থানীয় জাতের ধানের আবাদ হতো । কার্তিক অগ্রহায়ণ মাসে এ অঞ্চলে মানুষের তুলনামূলকভাবে অভাব দেখা দেয় । অতীতে মাত্র ৩ (তিন) মাসের চাষের ব্যবধানে রাজাসাইল ধান কৃষকের আঙ্গিনায় উঠত । একজন কৃষকের ধান প্রতিবেশীদেরও আহার যোগাত । এর কিছু দিন পর কার্তিক বালামধান পেকে যেতো । সব শেষে কাটা হতো লালমোটা বা সাদামোটা ধান । প্রায় ২ মাস ধরে নতুন ধানের ঘ্রাণে কৃষকের আঙ্গিনা ভরে থাকত । অতীতের এসব স্থানীয় জাতের ধানের নাম নতুন প্রজন্মের অনেকের কাছেই অজানা এবং অপরিচিত । সত্তর দশকের শেষভাগ পর্যন্ত রাজাসাইল বা বালাম জাতীয় ধানের আবাদ হতো প্রায় প্রতি কৃষকের জমিতে । কিছুটা উঁচু জমিতে এ ধান আবাদ হতো । দক্ষিণ অঞ্চলে লবণের তীব্রতা বেড়ে যাওয়ায় স্থানীয় জাতের ধান আস্তে আস্তে বিলীন হয়ে গেছে । তাই বর্তমানে কৃষকের জমিতে আর ঐ জাতের ধান দেখা যায় না ।

লবণ পানির প্রভাব দক্ষিণ অঞ্চলের জেলাগুলোতে সব সময়ই ছিল কিন্তু এর মাত্রা ছিল কম । অধিকাংশ কৃষিজাতীয় ফসল ৫০০ মি,মো/সেমি মাত্রার লবণাক্ততা সহ্য করতে

পারে । তবে স্থানীয় জাতের ঐ সব আমন ধান ৫০০ মি,মো/সেমি এর বেশী মাত্রার লবণ সহিষ্ণু ছিল । ফারাক্কা বাঁধের ফলে দক্ষিণ অঞ্চলে পানির লবণাক্ততার মাত্রা অনেক গুণে বেড়ে যায় । চিংড়ী চাষের কারণে অসময়ে লবণ পানি ফসলের জমিতে প্রবেশ করায় ফসলের ফলন আগের তুলনায় ব্যাপকভাবে হ্রাস পায় ।

অতীতে কৃষক যেভাবে ফসল ফলাতো

ক. মাঠ ফসল (Field crop) ঃ শুস্ক মৌসুমে অর্থাৎ নভেম্বর হতে মে পর্যন্ত পানিতে লবণের তীব্রতা বেশী থাকে। অতীতে এ সময় কৃষক নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় ফসলের জমিতে বাঁধ দিয়ে লবণ পানি প্রবেশ প্রতিরোধ করত । ফলে জমি শুকিয়ে যেতো । এ সময় মাটিস্থ লবণাক্ত পানি বাস্প হয়ে উড়ে যেতো এবং লবণ মাটির উপরে পড়ে থাকতো । জুন-জুলাই মাসে এ অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। তাই মাটির উপরে পড়ে থাকা লবণ বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে নদী ও খালে চলে যেতো। ফলে ফসলের জমিতে একদিকে সমুদ্র বা নদীর লবণাক্ত পানি প্রবেশ করতে পারত না, অন্য দিকে মাটির লবণাক্ততাও বৃষ্টির পানির প্রবাহে অপসারিত হতো ।

জুলাই আগষ্ট মাসে এ অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় । ফলে লবণ পানি ধীরে ধীরে মিষ্টি পানিতে পারিণত হয় । সে কারণে কৃষকগণ এসময় জমির বাঁধ কেটে দেয়। ফলে জোয়ার ভাটার সাথে মিষ্টি পানি কৃষি জমিতে প্রবেশ করে ও বের হয়। জোয়ারের পানির সাথে প্রচুর পলিমাটি থাকায় ফসলের জমি উর্বর হতো । তাই কৃষকগণ অতীতে জমি আবাদ করে প্রচুর ফসল পেতো ।

খ. বসত বাড়ির ফসল (Homestead crop) ঃ প্রতিটি কৃষকের বাড়ীতে কম বেশী রবিশস্য ও শাক-সব্জী আবাদের একটা নির্ধারিত স্থান ছিল । ঐসব স্থানে গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শীতে প্রচুর সব্জির আবাদ হতো। কৃষকগণ নিজের চাহিদা পূরণ করে উৎপাদিত সব্জি প্রতিবেশীকে দিতো বা বিক্রি করে বাড়তি আয় পেতো ।

গ. উদ্যান জাতীয় ফসল (Horticultural crop) ঃ সমুদ্রতীরবর্তী এলাকা যেখানে নদী-নালা, খাল-বিলের প্রভাব থাকে ঐসব স্থানে নারিকেল, সুপারী ভাল হয়। এসব ফসল উৎপাদনের জন্য কম তীব্রতার রসাল লবণ মাটি ও ঝিরঝিরে বাতাসের প্রয়োজন হয়। ফসলের চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবেশ এ অঞ্চলে ছিল । ফলে অর্থকরী ফসল হিসেবে ব্যাপকভাবে নারিকেল, সুপারীর আবাদ হতো । মাঠ ফসলের পাশাপাশি উদ্যান জাতীয় এসব ফসল হতেও কৃষক বাড়তি আয় পেতো ।

লবণ পানির তীব্রতা বেড়ে যাওয়ায় বসত বাড়ীর ফসল ও উদ্যান জাতীয় ফসলের উৎপাদন অনেকাংশে কমে গেছে। এমনকি কোথাও কোথাও গাছের চিহ্ন পর্যন্ত নেই। এ অঞ্চলের বসত বাড়ীতে এখন শুধু তীব্র লবণ সহিষ্ণু গেওয়া, বাইন, কেওড়া প্রভৃতি গাছ দেখা যায় ।

ঘ. পশু সম্পদ (Livestock) ঃ জমি চাষের জন্য প্রতি বাড়ীতে গরু অথবা মহিষ ছিল। কৃষি কাজের পাশাপাশি দুধ উৎপাদনেও ঐসব গরু ও মহিষ বিশেষ ভূমিকা রাখতো । সারা দেশের গ্রাম বাংলার সাথে এ বিষয়টির অনেক মিল আছে। তবে এ অঞ্চলে লবণ পানির প্রভাবে পশু সম্পদ ব্যাপকভাবে কমে গেছে । বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ডেইরী বা পোল্ট্রি খামার গড়ে উঠেনি ।

ঙ. মৎস্য সম্পদ (Fisheries) ঃ অতীতে এ অঞ্চলের নদী-নালা, খাল-বিলে প্রাকৃতিকভাবে ব্যাপক মাছ উৎপন্ন হতো। প্রায় প্রতিটি পরিবারের বসত বাড়ীতে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় রুই জাতীয় মাছ চাষ হতো । লবণাক্ততা বৃদ্ধির ফলে বসত বাড়ীতে রুই জাতীয় মাছ চাষ কমে গেছে এবং মিষ্টি পানির মাছ হ্রাস পেয়েছে ।

লবণাক্ত অঞ্চলে কৃষির বর্তমান অবস্থা

ক. মাঠ ফসল (Field crop) ঃ বিগত দুই দশকে ক্রমবর্ধমান হারে চিংড়ী চাষ বেড়েছে । ফারাক্কা বাঁধের ফলে মিষ্টি পানির প্রবাহ কমে গেছে, ফলে সমুদ্রের লবণ পানি জোয়ারের প্লাবনে নতুন এলাকায় প্রবেশ করে লবণাক্ত এলাকা বর্ধিত করেছে। লবণের প্রভাবে মাঠ ফসল উৎপাদন অর্ধেকেরও নিচে নেমে এসেছে । অনেক স্থানীয় জাতের ধান বিলীন হয়ে গেছে। নিম্ন ও মধ্যবিত্ত কৃষক চাষাবাদ ছেড়ে দিয়ে ভিন্ন জীবিকার সন্ধানে গ্রাম ছেড়েছে, যাদের উপায় নেই তারা পথে বসেছে । পূর্বে এক বিঘা জমিতে ১৫-২০ মন ধান উৎপন্ন হতো । বর্তমানে উৎপন্ন হয় ৪-৫ মন । লবণ অঞ্চলে উচ্চ ফলনশীল জাতের ধান খুবই কম উৎপন্ন হয় । তবে যেসব এলাকায় ভেড়ি বাঁধ দিয়ে লবণ পানি প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়েছে ঐসব এলাকায় স্থানীয় জাতের ধানের পাশাপাশি উচ্চ ফলনশীল (HYV) জাতের ধানের আবাদ হয়ে থাকে ।

খ. উদ্যান ও আঙ্গিনা ফসল ঃ মাঠ ফসলের ন্যায় উদ্যান ও আঙ্গিনা ফসল অনেকাংশে কমে গেছে । নারিকেল, সুপারী বিলীন হয়ে গেছে । বেঁচে থাকা গাছগুলো নির্জীব । গাছের বৃদ্ধি ও ফলন মারাত্মক কম । রবিশস্য উৎপন্ন হয় কম। তবে বর্ষা মৌসুমে কিছু শাক-সজি উৎপন্ন হয় । চাহিদার তুলনায় শাক-সজির উৎপাদন কম হওয়ায় দেশের অন্য এলাকায় উৎপাদিত শাক-সজির উপর জনসাধারণের নির্ভর করতে হয় ।

গ. পশু সম্পদ ঃ চিংড়ী চাষ ও লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাওয়ায় সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পশু সম্পদ । প্রাকৃতিকভাবে জন্মানো বিলের ঘাস খেয়েই গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া বেঁচে থাকত । চিংড়ী চাষের জন্য জমিতে লবণ পানি প্রবেশ করায় মাটি পানিতে ডুবে থাকে, ফলে কোন ঘাস জন্মায় না । খাদ্যের অভাবে পশু সম্পদ আস্তে আস্তে কমে গেছে ।

ঘ. মৎস্য সম্পদ ঃ মিষ্টি পানির মাছ কমে গেছে। সাধারণ মানুষের বসত বাড়ীতে চাষযোগ্য রুই জাতীয় মাছের উৎপাদন কমেছে । তবে চিংড়ীর (বাগদা) উৎপাদন বর্তমানে কয়েকগুণ বেড়ে গেছে । চিংড়ী চাষ করতে গিয়ে বিগত একদশকে অন্যান্য মাছের রেণু নিধন হয়েছে বিপুল পরিমাণে। চিংড়ী চাষের প্রথম পর্যায় প্রাকৃতিক চিংড়ীর রেণু/পোনা জোয়ারের পানির সাথে চিংড়ী ঘেরে প্রবেশ করত । সে চিংড়ী পোনা ঘেরে আটকে রেখে বড় করে ঘের মালিকগণ বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করতেন । এভাবে ৫/৭ বছর চলার পর চিংড়ী পোনা উৎপাদনকারী স্ত্রীজাতীয় চিংড়ীর সংখ্যা সমুদ্রে হ্রাস পেতে থাকে । ফলে প্রাকৃতিকভাবে উৎপন্ন পোনার সংকট দেখা যায় । এ সময় উন্মুক্ত জলাশয় হতে বিশেষ ধরনের জাল দিয়ে চিংড়ী পোনা আহরণ শুরু হয় । চিংড়ী পোনা আহরণের সময় অন্যান্য মাছের রেণু ধ্বংস হতে থাকে । কেননা এ এলাকার দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের মানুষ জাল দিয়ে বিভিন্ন মাছের রেণু একত্রে সংগ্রহের পর চিংড়ী রেণু আলাদা করে রেখে অন্যান্য মাছের রেণু নদীর চরে ফেলে দেয় । কারণ অন্যান্য প্রজাতি মাছের রেণুর কোন বাজার মূল্য নেই । ফলে আস্তে আস্তে অন্যান্য প্রজাতির মাছ কমে গেছে । চিংড়ী মাছের রেণু হাজার প্রতি মূল্য ৫০০ হতে ২০০০ টাকা পর্যন্ত । আন্তর্জাতিক বাজারে চিংড়ীর মূল্য বেড়ে যাওয়ায় এ অঞ্চলে চিংড়ী চাষ ক্রমেই বেড়েছে (চিত্র-১)।

চিত্র-১. বিগত দুই দশকের চিংড়ী (বাগদা) চাষ বৃদ্ধির তুলনামূলক হার ঃ

জেলা	সাল ১৯৮৪-৮৫		সাল ১৯৯৭-৯৮	
	চিংড়ীঘের সংখ্যা	ঘেরের আয়তন (হেক্টর)	চিংড়ীঘের সংখ্যা	ঘেরের আয়তন (হেক্টর)
খুলনা	১,০০০	১২,৮২১	৪,০০০	৪০,০০০
বাগেরহাট	৪৫১	১৯,৯৫৫	৪,৯০০	৪৮,৭০০
সাতক্ষীরা	৩৭৭	১৩,২৪০	৫,০০০	৩০,২৩১
পটুয়াখালী	-	-	৪৮	২৫২
নোয়াখালী	-	-	৩০	১৫০
কক্সবাজার	২,৩৯৯	২১,৪৬৮	২,০০০	২৭,৫০০

উৎস্য ঃ Bangladesh at 25 P.335 দৈনিক মুক্ত কণ্ঠ, ১৬ অক্টোবর ৯৯

চিংড়ী চাষ বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন । এ অর্থ ধাপে ধাপে সরকার হতে শুরু করে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত একজন চিংড়ী ঘের মালিক পেয়ে

থাকেন । তবে সমস্যা দরিদ্র প্রান্তিক চাষী ও মধ্যবিত্ত চাষীর । কারণ তারা তাদের স্বল্প পরিমাণ জমিতে চিংড়ী চাষ করতে পারেন না । অর্থের প্রয়োজনে অথবা বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষাপটে তাদের জমি মহাজন ঘের মালিকদের ৩ হতে ৫ বছর মেয়াদে লীজ দিয়ে দেয় । লবণ পানিতে অধিক পরিমাণে চিংড়ী উৎপাদন হয় । তাই ঘের মালিকগণ জানুয়ারী/ফেব্রুয়ারী মাসে চাষযোগ্য জমিতে লবণ পানি প্রবেশ করায় । এতে চিংড়ীর উৎপাদন ভাল হয় । কিন্তু কৃষকের ফসলের জমির উর্বরতা ও উৎপাদন ক্ষমতা কমে যায় । ফলে কৃষক বছর শেষে সামান্য ফসল ঘরে তুলতে পারে । অর্থের প্রয়োজনে তাদের সামান্য ফসলের জমিও একসময় চিংড়ী ঘের মালিকের কাছে বিক্রি করে দেয় । এভাবে আর্থিক মেরুকরণ চলছে বিগত একদশক থেকে ।

অধিক মাত্রায় লবণাক্ততা বৃদ্ধির কারণ

বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলবর্তী দক্ষিণ অঞ্চল সমুদ্রের লবণ পানির প্রভাবে লবণাক্ত অঞ্চল হিসেবে স্বীকৃত । পূর্বে লবণের তীব্রতা কম থাকায় এবং প্রাকৃতিক বৃষ্টিপাত বেশী হওয়ায় বর্ষা মৌসুমে প্রচুর আমন ধানের আবাদ হতো । সারা বছর ফসল উৎপাদনের লক্ষ্যে ১৯৬০ সালে পানি উন্নয়ন বোর্ড লবণ পানি প্রতিরোধের জন্য এ অঞ্চলে ওয়াবদা বাঁধ তৈরীর কাজ শুরু করে। সমুদ্রের জোয়ারের লবণ পানির হাত হতে ফসল রক্ষার জন্য বাঁধ দেয়া হয়। পানি উন্নয়ন বোর্ড ১৯৯০ সাল পর্যন্ত ৪,৮০০ কিঃমিঃ লম্বা বাঁধ তৈরী করে ৯,০০০ বর্গকিলোমিটার ফসলের জমি লবণ পানির প্রভাব হতে রক্ষা করে। চিংড়ী চাষ ক্রমেই জনপ্রিয় হওয়ায় পানি উন্নয়ন বোর্ডের ঐ প্রকল্প আর বেশী দূর যেতে পারেনি । তাছাড়া পানি উন্নয়ন বোর্ডের লবণ পানি প্রতিরোধী বাঁধের কারণে অনেক এলাকায় ব্যাপক প্রাকৃতিক বিপর্যয় দেখা দেয়। ফলে জনসাধারণের নিকট হতে বাধা আসে । বিশেষ করে যশোর, খুলনা জেলার বিল ডাকাতিয়া এলাকায় পানি উন্নয়ন বোর্ডের বাধের কারণে নদীর তীরে বাঁধের বাইরে পলি জমে উচু হয়ে গেছে । বিল নিচু থাকায় এবং বাঁধের বাইরে পলি জমে উচু হওয়ায় পানি নিষ্কাশনে সমস্যা দেখা দেয় । ফলে ঐ এলাকায় স্থায়ী জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয় ।

অতীতে পদ্মা নদীর বিশুদ্ধ পানি প্রবাহে এ অঞ্চলের পানি ও মাটিতে লবণের মাত্রা কম ছিল । দক্ষিণ অঞ্চলের তিনটি জেলা বাগেরহাট, খুলনা ও সাতক্ষীরা অঞ্চলে পদ্মার শাখা নদী গড়াই ও মধুমতি নদীর বিশুদ্ধ পানির প্রবাহের কারণে লবণের তীব্রতা ফসলের সহনশীল মাত্রায় ছিল । বছরের বিভিন্ন মাসে এ জেলাগুলোতে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় লবণাক্ততা দেখা যায় (চিত্র-২)।

চিত্র-২. জেলা ভিত্তিক বছরের বিভিন্ন মাসে লবণাক্ততার মাত্রা ।

মাস	জেলা		
	খুলনা লবণের মাত্রা (পিপিএম)	সাতক্ষীরা লবণের মাত্রা (পিপিএম)	বাগেরহাট লবণের মাত্রা (পিপিএম)
জানুয়ারী	১-৫	৫-১৪	১-৪
ফেব্রুয়ারী	৪-৫	৪-১৫	৪-৬
মার্চ	৮-১২	১১-২০	৬-৭
এপ্রিল	১২-১৫	১৪-২৩	৭-১০
মে	১৮-২২	১৬-২৪	১০-১৪
জুন	১২-২০	১০-২০	১০-১৬
জুলাই	২-০	৮-১৪	৬-২
আগষ্ট	০-০	৫-৯	২-০
সেপ্টেম্বর	০-০	৫-৯	২-০
অক্টোবর	০-০	৫-৯	২-০
নভেম্বর	০-০	০-৫	০-০
ডিসেম্বর	০-১	১-৬	০-১

সূত্র ঃ সাপ্তাহিক রোববার ১২ সেপ্টেম্বর ৯৯

চিত্র-২ হতে দেখা যায় জানুয়ারী হতে জুন পর্যন্ত সব জেলাতেই লবণাক্ততা বাড়তে থাকে, এ বৃদ্ধির পার্থক্য ৫ হতে ২০ পিপিএম। জুলাই হতে ডিসেম্বর পর্যন্ত লবণের তীব্রতা কম থাকে এর মাত্রা ০ হতে ৮ পিপিএম। তিনটি জেলার মধ্যে তুলনামূলকভাবে সাতক্ষীরায় লবণাক্ততা বেশী (১৬ হতে ২৪ পিপিএম) থাকায় এ জেলায় অধিক পরিমাণ চিংড়ী চাষ হয়ে থাকে। খুলনা ও বাগেরহাট জেলায় লবণাক্ততা কম থাকায় (১২ হতে ১৬ পিপিএম) ধান ও চিংড়ী উভয় চাষ হয় । বাগেরহাট ও খুলনা জেলার অনেক স্থানে একই জমিতে আমন ধান ও চিংড়ী আবাদ হয় । এক্ষেত্রে ধানের ফলন অত্যন্ত কম হয় । মৌসুমী বৃষ্টিপাত বেশী হলে ধানের ফলন ভাল হয় । কিন্তু চিংড়ী মাছের উৎপাদন কমে যায় । বৃষ্টি কম হলে মাছের উৎপাদন বাড়ে এবং ধানের উৎপাদন কমে যায় । এর অন্যতম প্রধান কারণ বৃষ্টি বেশী হলে মাটি ও পানির লবণাক্ততা কমে যায়, ফলে ধানের ফলন ভাল হয় । অন্যদিকে লবণাক্ততা কমে গেলে চিংড়ীর উৎপাদন কম হয় । কারণ চিংড়ী চাষের জন্য লবণাক্ত পানি অপরিহার্য।

৯৭৫ সালের প্রথম দিকে পদ্মা নদীর উজানে ফারাক্কা বাধ দেয়ার ফলে পদ্মা নদীতে বিশুদ্ধ পানির প্রবাহ কমে যায়। ফলে শুষ্ক ঋতুতে সমুদ্র হতে প্রায় ২৪১ কিঃমিঃ ভিতরে মাগুরা পর্যন্ত জোয়ারের লবণ পানির প্রবাহ বিস্তৃত হয় । এ সময়

লবণের মাত্রা হয় ২০০০ Micro Mhos (রশিদ, ১৯৯১) । পূর্বে গড়াই নদীতে প্রবাহিত মিষ্টি পানির প্রবাহ/স্রোত 'বড়দিয়া' নামকস্থানে সমুদ্র হতে আগত জোয়ারের লবণ পানির প্রবাহকে বাধা দিত এবং গড়াই নদীর পানির স্রোত নিম্নমুখী হওয়ায় লবণ পানি সমুদ্র হতে স্থলভাগে প্রবেশ করতে পারত না । বরং গড়াই নদীর বিশুদ্ধ পানির স্রোতে শুস্ক মৌসুমে দক্ষিণ অঞ্চলের নদী-নালার লবণ পানি ধীরে ধীরে মিষ্টি পানিতে পরিণত করতো । কিন্তু ফারাক্কা বাধের ফলে পদ্মা নদীতে পানি হ্রাস পাওয়ায় গড়াই নদীর পানির প্রবাহ কমে যায়। ফলে দক্ষিণ অঞ্চলের জেলাগুলিতে সমুদ্রের লবণ পানির তীব্রতা অনেকাংশে বেড়ে যায় । দ্বিতীয়তঃ শুস্ক মৌসুমে বৃষ্টিপাত কমে যাওয়ায়ও লবণাক্ততা বেড়ে গেছে । এ লবণাক্ততাই ফসল হানির প্রধান কারণ ।

কৃষি জমিতে লবণাক্ততার প্রভাব

ক. ফসলের উপর প্রভাব ঃ লবণাক্ততা বৃদ্ধির ফলে মাঠ ফসল হতে শুরু করে আঙ্গিনা ফসল সবক্ষেত্রে ব্যাপক হারে ফলন কমে গেছে । মৃত্তিকা বিজ্ঞানীগণের মতে লবণাক্ত অঞ্চলের মাটিতে প্রাকৃতিকভাবে সোডিয়াম, ক্যালশিয়াম ও ম্যাগনেশিয়াম জাতীয় খাদ্যোপাদান বেশী থাকে । এ অঞ্চলে মাটির PH ৭.৫ হতে ৮.৫ । বর্তমান সময় লবণাক্ততার পরিমাণ পূর্বের তুলনায় বেড়ে যাওয়ায় মাটি হতে গাছ প্রয়োজনীয় খাদ্যোপাদান (Essential nutrient elements) সহজে গ্রহণ করতে পারে না । মাটিতে লবণ পানির ঘনত্ব বেশী থাকার কারণে গাছের শিকড় হতে পানি মাটিতে চলে যায় (Deplasmolysis) এবং গাছ আস্তে আস্তে নিস্তেজ হয়ে মারা যায় । লবণাক্ত অঞ্চলে এ কারণে গাছের মৃত্যু হার বেশী । লবণাক্ত মাটিতে সোডিয়াম ক্লোরাইড, পটাশিয়াম ক্লোরাইড ও ক্যালশিয়াম ক্লোরাইড বেশী থাকে । এ জাতীয় লবণে ক্লোরিন আয়ন (cl) থাকার কারণে গাছের সবুজ পাতা ক্লোরিনেটেড বা বিবর্ণ হয়ে ফ্যাকাশে সবুজ বর্ণ ধারন করে। গাছের পাতা বিবর্ণ হওয়ার কারণে সালোকসংশ্রেষণ (Photosynthesis) কমে যায় । ফলে গাছ প্রয়োজনীয় খাদ্য উৎপাদন করতে পারেনা। এ কারণে ফসলের ফলন কম হয়। চিংড়ী চাষের জন্য মাটির PH ও লবণাক্ততা বেশী হলে ভাল হয় । তাই চিংড়ী খামার মালিকগণ কৃত্রিমভাবে এ অঞ্চলের মাটিতে চুন ও লবণ প্রয়োগ করেন । এর প্রভাবে মাটির PH ৮ হতে ৯ পর্যন্ত বর্ধিত হয় । ভাল ফসল উৎপাদনের জন্য মাটির PH ৬.৫ হতে ৭.০ উত্তম । অধিক মাত্রার PH ও লবণাক্ততা ফসল হানির অন্যতম প্রধান কারণ ।

খ. পরিবেশ বিপর্যয় ঃ লবণাক্ততা বৃদ্ধির ফলে ফসলের সাথে সাথে এ অঞ্চলে বৃক্ষরাজী ধ্বংস হয়ে গেছে। ফলে প্রাকৃতিক বিপর্যয় তথা ঝড়, জলোচ্ছাস প্রতি

বছরে দেখা যায় । বিশেষ করে এপ্রিল-মে এবং নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বেশী দেখা যায় ।

গ. সামাজিক সমস্যা ঃ কৃষি জমির উৎপাদন কমে যাওয়ায় এবং চিংড়ী উৎপাদন লাভজনক হওয়ায় নিম্ন ও মধ্যবিত্ত কৃষকগণ প্রতিনিয়ত তাদের জমি বিক্রি করে দেয় ধনী চিংড়ীঘের মালিকদের কাছে । চিংড়ীঘের মালিক মানেই বেশী জমির মালিক একথা সবক্ষেত্রে সত্য নয় । কারণ বাহুবলে ও সন্ত্রাসী কার্যক্রমের মাধ্যমেও অনেকে রাতারাতি ঘের মালিক হয়েছেন । এসব ঘের মালিকগণ নিঃস্ব অবস্থা হতে অর্থনৈতিকভাবে সমাজের উচুস্থানে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন । সমাজে ভদ্র হিসেবে স্বীকৃত দুর্বল মহাজনগণ তাদের জমির নিরাপত্তা বিধান করতে ব্যর্থ হওয়ায় প্রভাবশালীদের কাছে জমি লীজ দিতে বাধ্য হয় । আবার অনেক ক্ষুদ্র চাষী অর্থের প্রয়োজনে অথবা তার স্বল্প জমিতে চিংড়ী চাষ করার সুযোগ না থাকায় ৩ হতে ৫ বছর মেয়াদে চিংড়ীঘের মালিকদের কাছে কৃষি জমি লীজ দিয়ে দেয় । ফলে এ অঞ্চলে সামাজিক কাঠামোর অনেক পরিবর্তন হয়েছে । নিরীহ মানুষ অনেকে গ্রাম ছেড়েছে ।

গরু মহিষ ব্যাপকভাবে কমে যাওয়ায় কৃষি জমি চাষাবাদে সমস্যা দেখা দেয় । তাই অনেক মধ্যবিত্ত পরিবার জমি বর্গা দিয়ে দেয় । ফসলের উৎপাদন কমে যাওয়ায় নিম্ন ও মধ্যবিত্ত কৃষকের অসুবিধা হলেও সমাজের উচু শ্রেণীর মানুষ ভাল আছে। তবে তার সংখ্যা হাতে গোনা । দিনমজুরদের ভাগ্য কিছুটা পরিবর্তন হয় চিংড়ী মৌসুমে । এ সময় তারা দৈনিক ১০০-১৫০ টাকা পারিশ্রমিক পায় ।

কৃষি সমস্যা সমাধানের উপায়

প্রবন্ধের শুরুতেই উল্লেখ করা হয়েছে কৃষিজ উৎপাদন প্রধানতঃ ফসল, পশু সম্পদ ও মৎস্য সম্পদ হতে আসে । এককভাবে এর কোন একটা দিয়ে উন্নয়ন সম্ভব নয় । তাই ফসল ও পশু সম্পদ ধ্বংস করে শুধু চিংড়ী উৎপাদন বাড়ালে প্রকৃত উন্নয়ন হবে না । এ অঞ্চলের কৃষকের কিছু না কিছু কৃষি জমি আছে, তাই ভাল ফসল হলে কম বেশী সব পরিবারের উপকার হয় । কিন্তু ফসল ধ্বংস করে শুধু চিংড়ী উৎপাদন করলে সমাজের বিশেষ এক শ্রেণীর মানুষের উপকার হয়। বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষাপটে এ বিষয়ে নতুন করে চিন্তা ভাবনার প্রয়োজন আছে । জাতীয় পরিকল্পনায় এ অঞ্চলের মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়া গেলে এলাকার মানুষের ভাগ্য বদলাতে পারে । সাথে সাথে দেশ বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারে । নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো এ সমস্যা সমাধানে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে-

ক. ফসলী জমি ও চিংড়ী আবাদের জমি সনাক্ত করে আলাদা করা ঃ সব জমিতে ভাল ফসল হয় না, আবার সব জমিতে ভাল চিংড়ী উৎপন্ন হয় না। যে জমি যে কাজে লাগে সে জমিতে সে জাতীয় ফসল অর্থাৎ চিংড়ী অথবা ধান উৎপাদনের পদক্ষেপ নেয়া যায়। তবে, যে জমিতে ধান ও চিংড়ী উভয় উৎপন্ন হয় সে জমিতে ধানের উৎপাদনকে অগ্রাধিকার দিয়ে কৃষকের সুবিধার্থে নীতিমালা প্রণয়ন করা যেতে পারে। এর ফলে ফসলের জমিতে চিংড়ী ঘের মালিকগণ অসময়ে লবণ পানি উঠাতে পারবেন না। কৃষকের সুবিধার্থে ফসল আবাদের সময় জমি হতে ঘের মালিকগণ পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা নিলে জমি চাষে কোনো সমস্যা হবে না। ফলে কৃষক জমি চাষ করে ফসল ঘরে তুলতে পারবেন।

খ. ভেড়িবাঁধ ঃ কিছু কিছু এলাকায় ভেড়িবাঁধ দিয়ে লবণ পানি প্রতিরোধ করা যেতে পারে। এর ফলে ২/৩ বছরের মধ্যে জমির উর্বরতা ফিরে আসবে এবং একই জমিতে বছরে একাধিক ফসল উৎপন্ন করা সম্ভব হবে। ভেড়িবাঁধের ভিতর আঙ্গিনা ও উদ্যান জাতীয় ফসলের উৎপাদন আগের মত বেড়ে যাবে। ইতোমধ্যে কিছু এলাকায় ভেড়িবাঁধ দেয়ায় ভাল ফলাফল লক্ষ্য করা গেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় বাগেরহাট জেলার রামপাল উপজেলার 'ফয়লা' নামক গ্রামটি ভেড়িবাঁধের আওতায় আনা হয়েছে ৩/৪ বছর পূর্বে। ইতোমধ্যে ঐ এলাকায় একাধিক ফসল আবাদ শুরু হয়েছে। সাথে সাথে নীচু এলাকায় ও পুকুরে স্বাদুপানির মাছ ও 'গলদা' চিংড়ী আবাদে ভাল ফল পাওয়া গেছে। একই উপজেলার অন্য এলাকায় ভেড়িবাঁধ না থাকায় শুধু লবণ পানিতে চাষযোগ্য 'বাগদা' চিংড়ী আবাদ হয়। লবণের প্রভাবে এখানে ভাল ফসল উৎপন্ন হয় না।

গ. কৃষি গবেষণার মাধ্যমে লবণ সহিষ্ণু বিভিন্ন ফসলের উন্নতজাত উদ্ভাবন করে এবং লবণাক্ত এলাকার স্থানীয় জাতের বিভিন্ন ফসলের বীজ সংরক্ষণ করে সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে।

ঘ. সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সমন্বয় করে এলাকার পরিবেশ ও জনসাধারণের চাহিদার আলোকে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে। এসব প্রকল্পে স্থানীয় প্রযুক্তি ও জনসাধারণের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে সমস্যার সমাধান হতে পারে। সর্বোপরি সরকারিভাবে বাস্তব সম্মত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা যেতে পারে।

ঙ. চিংড়ী চাষের নীতিমালা প্রণয়ন করে সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে।

উপসংহার

আমাদের দেশের মোট আয়তনের এক পঞ্চমাংশ এলাকা জুড়ে বিস্তৃত সমুদ্র তীরবর্তী (coastal area) এলাকা। এ এলাকায় অর্ধেকেরও বেশী কৃষি জমি বিভিন্ন মাত্রার লবণাক্ততায় ক্ষতিগ্রস্ত। মৌসুমী বৃষ্টিপাত এ অঞ্চলের কৃষি ফসল

উৎপাদনের অন্যতম প্রধান উপাদান । প্রকৃতি নির্ভর বৃষ্টিপাতের প্রভাবে এলাকার কৃষক নিজস্ব কলাকৌশল প্রয়োগ করে যুগ যুগ ধরে ফসল উৎপাদন করে এসেছে । সত্তর দশকের মাঝামাঝি ফারাক্কা বাঁধের কারণে স্বাদু পানির প্রবাহ কমে যায় । ফলে সমুদ্রের লবণ পানি নতুন নতুন এলাকা প্লাবিত করে এবং কৃষি জমি লবণাক্ত হয়। আশির দশকে ব্যাপক হারে বাগদা চিংড়ীর আবাদ বৃদ্ধি পাওয়ায় লবণ পানির প্রভাবে কৃষি জমির উর্বরতা ও উৎপাদনশীলতা কমে যায় । লবণাক্ততা এ অঞ্চলের কৃষি কাজের জন্য একটা প্রাকৃতিক দূর্যোগ । সত্তর দশকের তুলনায় বর্তমান সময় লবণাক্ত অঞ্চলের কৃষি ফসলের উৎপাদন ৬০-৭০ ভাগ কমে গেছে । নিম্ন ও মধ্যবিত্ত কৃষক ও প্রান্তিক চাষী কৃষি জমি বিক্রি করে এলাকা ছেড়েছে অথবা জীবিকার সন্ধানে পথে বের হয়েছেন । উচ্চবিত্ত মহাজন চিংড়ী চাষ করে লাভবান হয়েছেন । সন্ত্রাস ও ক্ষমতার দাপটে এক শ্রেণীর মানুষ এলাকার নিরীহ কৃষকের নিকট হতে কৌশলে বা জোরপূর্বক জমি লীজ নিয়ে রাতারাতি সমাজের উচু স্তরে নিজের স্থান করে নিয়েছে । জমির প্রকৃত মালিক কৃষকের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে গেছে । একই সাথে লবণাক্ত অঞ্চলের কৃষিতেও ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে । বিভিন্ন ফসলের স্থানীয় জাত বিলুপ্ত হয়ে গেছে । কৃষি জমির স্থান দখল করে নিয়েছে চিংড়ী ঘের। ১৯৮০ সালে চিংড়ী চাষের জমি ছিল ২০,০০০ হেক্টর । ১৯৯০ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ১,১৫,০৮৮ হেক্টরে পরিণত হয়েছে, বৃদ্ধির হার ৪৭৫% । বর্ধিত হারে চিংড়ী চাষ বর্তমানে ব্যাপক পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে । চিংড়ী চাষের ফলে ফসলের জমির পরিমাণ কমেছে, ফসল উৎপাদন কমেছে, লবণাক্ততা বেড়েছে, মানুষের পেশার পরিবর্তন হয়েছে, সর্বোপরি ভূমিহীন মানুষের সংখ্যা বেড়েছে ।

আন্তর্জাতিক বাজারে চিংড়ীর মূল্য ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেলেও ২০০১-২০০২ অর্থ বছরে চিংড়ীর আন্তর্জাতিক মূল্য ব্যাপক হারে কমে গেছে । বর্তমানে চিংড়ী খামারগুলো মারাত্মকভাবে ভাইরাস রোগে আক্রান্ত । সুতরাং লবণাক্ত এলাকার সব শ্রেণীর মানুষ কম বেশী ক্ষতিগ্রস্ত । তাই এলাকার মানুষ আজ লবণাক্ত অঞ্চলের অতীত কৃষি নিয়ে নতুন করে চিন্তা ভাবনা করছেন । সঠিক পরিকল্পনা ও দিকনির্দেশনা আবার লবণাক্ত অঞ্চলের কৃষকের মুখে হাসি ফুটাতে পারে ।

তথ্যসূত্র

১. Ali, A, F. Islam and R, Kuddus, Development Issues of Bangladesh. pp, 384-385

২. Elahi, K.M, S.C. Das, S. Sultana. Geography of Coastal Environment: A study of selected Issues. pp 335-365

৩. Hossain, M.A. Life pattren and economic activities of coastal people in Bangladesh: Research Report, BPATC.

৪. Statistical pocket book, 2000, Bangladesh Bureau of Statistics,P- 274

৫. বিষ্ণু দাস, চিংড়ী চাষ ও ব্যবস্থাপনা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮, পৃঃ ৭

৬. সাপ্তাহিক সুন্দরবন ৯ অক্টোবর ১৯৮৯

৭. সাপ্তাহিক রোববার ১২ সেপ্টেম্বর ১৯৯১

৮. দৈনিক জনতা ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯

৯. দৈনিক মুক্তকণ্ঠ ১৬ অক্টোবর ১৯৯৯

১০. দৈনিক মানব জমিন ১৬মে ২০০১

১১. দৈনিক মানব জমিন ১৫মে ২০০২

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা,
সপ্তম বর্ষ সংখ্যা কার্তিক ১৪০৯

ঢাকা মহানগরের পরিবেশ দূষণ : একটি পর্যালোচনা

ব্যোমকেশ তালুকদার*

Environmental Pollution of Dhaka City: A Discussion.

Byomkesh Talukder

Abstract : Dhaka has come to be known as one of the megacities of the world. The scale of pollution is gradually increasing in the City. Like all megacities Dhaka has many serious problems. The environmental problem is one of among them. Dhaka used to be known as a city of greenery but due to over population it has become the most polluted city in the world. The environmental condition of this city is destroying day by day. Now Dhaka City is subject to over population, air pollution, and water pollution, sound pollution and waste pollution. The factors behind these pollutions are different and their impacts on health are also enormous. The pollutions of this city are making it unhealthy for living. For its unhygienic environmental condition the Dhaka City dwellers are facing serious health problems. In this paper attempt has been made to identify the causes of pollutions, their impact and remedies of the environment of Dhaka.

১.০ ভূমিকা

বর্তমানে বিশ্বে বিভিন্ন পরিবর্তনের কথা নিয়ে প্রচুর আলোচনা হচ্ছে; এগুলো নিয়ে উন্নত বিশ্বে বিশেষত পশ্চিমা দুনিয়ায় অনেক ঢাক-ঢোল পেটোনো হলেও একথা অনস্বীকার্য যে, উন্নয়নশীল বিশ্বে তার কোন ইতিবাচক প্রভাব পড়েনি, বরং এখানকার অধিকাংশ দেশই ক্রমবর্ধমান মারাত্মক সমস্যা দ্বারা আক্রান্ত । এগুলোর মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হল পরিবেশগত সমস্যা । গোটা বিশ্ব আজ পরিবেশ দূষণের ফলে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে । এর প্রভাব বাংলাদেশেও বিস্তার লাভ করেছে । আর এই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে ঢাকা মহানগরী । এক ভয়ানক পরিস্থিতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে প্রায় এক কোটি লোকের আবাসস্থল ঢাকা মহানগরী। অবিরাম দূষণের ফলে মহানগরী দ্রুত মানব বসবাসের অযোগ্য হয়ে উঠছে । বর্তমানে দিনের পর দিন বায়ু দূষণ, পানি দূষণ, শব্দ দূষণ, ইত্যাদির ফলে ঢাকার সার্বিক পরিবেশ দূষণ প্রকট আকার ধারণ করছে । নগর পরিবেশ সংরক্ষণ এবং পরিবেশ দূষণের বিষয়টি আজ সারা বিশ্বেই বেশ গুরুত্বের সাথে আলোচিত হচ্ছে । নগর পরিবেশ দূষণের ফলে নগরবাসীর স্বাস্থ্য আজ হুমকির মুখে বিশেষ করে আমাদের মত তৃতীয় বিশ্বের দেশ গুলোতে । ঢাকা মহানগরীর পরিবেশ দূষণের মাত্রা বিশ্বের দূষিত নগরীগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ, যা আমাদের সবাইকে আতঙ্কিত করে তুলছে। বিশ্ব ব্যাংক, জাতিসংঘ পরিবেশ কার্যক্রম,

* মূল্যায়ন কর্মকর্তা, বিপিএটিসি,সাভার, ঢাকা

জাতিসংঘ উন্নয়ন কার্যক্রম ও ওয়ার্ল্ড রিসোর্সেস ইনষ্টিটিউট এর উদ্যোগে যৌথভাবে প্রকাশিত বিশ্ব সম্পদ ১৯৯৯ শীর্ষক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, বিশ্বে মৃত্যু ও রোগব্যাধির প্রায় ২৫ ভাগ ঘটছে পরিবেশের কারণে । এ অবস্হায় নগরের পরিবেশীয় অবস্হা আমাদের সবার মধ্যে আলোচিত হচ্ছে। বিপুল জনসংখ্যা অধ্যুষিত ঢাকা শহরের পরিবেশের করুণ অবস্হা আমাদের ভাবিয়ে তুলছে । বাংলাদেশে নগরায়নের হার খুব দ্রুত যার ফলে বর্তমানে ঢাকা মহানগরে দ্রুতহারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে । ১৯৯১ সালে ঢাকা শহরের জনসংখ্যা ছিল ৬০ লক্ষ বর্তমানে প্রায় এক কোটি । ঢাকা শহরের দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি শহরটিকে নাগরীক ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করছে । ঢাকাবাসীরা পরিবেশের কথা চিন্তা না করেই যত্র তত্র বসতি স্হাপন করে চলছে । যার ফলে ঢাকার পরিবেশের উপর চাপ পড়ছে । ঢাকা শহরের পরিবেশের করুণ অবস্হার জন্য এ শহর বসবাসের উপযুক্ত নয় । নানাবিধ কারণে ঢাকার পরিবেশ দূষণ নগরবাসীর জন্য এক বিড়ম্বনা ও বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঢাকা মহানগরের পরিবেশ দূষণ আলোচনায় এ শহরের জনসংখ্যা, বায়ু দূষণ, পানি দূষণ, শব্দ দূষণ, অবর্জনা দূষণ, অ্যাপার্টমেন্টের পরিবেশগত সমস্যা ইত্যাদি আলোচনা করা হবে।

২.০ ঢাকা মহানগরীর পরিবেশ দূষণ

ঢাকার পরিবেশ আজ মারাত্মক দূষণে দূষিত । ঢাকার বহুবিধ পরিবেশ দূষণের মধ্যে নিচের দূষণ প্রধান :-

- জনসংখ্যার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি,
- বায়ু দূষণ,
- পানি দূষণ,
- শব্দ দূষণ,
- ময়লা আবর্জনার দূষণ ও
- এ্যাপার্টমেন্টের পারিবেশিক সমস্যা ।

৩.০ জনসংখ্যার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি

ঢাকার জনসংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৪৭-এ দেশভাগের পর থেকে ঢাকার গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে সারা দেশ থেকে ক্রমাগত লোক ছুটে এসেছে ঢাকার দিকে। ঢাকার পরিবেশের ক্রমবর্ধমান নাজুক অবস্থার জন্য দায়ী এর জনসংখ্যা বৃদ্ধি। ১৯৫০ সালে ঢাকার লোকসংখ্যা ছিল মাত্র ৪ লাখ ৩০ হাজার, আজ প্রায় প্রায় এক কোটি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসেবে১০ লাখ লোকের একটি শহরে প্রতিদিন দরকার ৬২ হাজার ৫০০ মেট্রিক টন পানি, ২০০ মে. টন খাবার এবং ৯৫০০ মে. টন জ্বালানি এই হিসাব থেকে বুঝা যায় ঢাকাতে প্রতিদিন কি পরিমাণ পানি ও

খাবার প্রয়োজন। আবার শহর যেমন গ্রহণ করে তেমনি বর্জনও করে। এই শহরের বর্জ্য হলো- ৫০ হাজার মে. টন ব্যবহৃত ও নষ্ট পানি, ২ হাজার মে. টন কঠিন বর্জ্য এবং ৯৫০ মে. টন বায়ু দূষক (উৎস:পরিবেশ অধিদপ্তর)। ঢাকার জনসংখ্যা বৃদ্ধির চিত্রটি এরূপঃ ১৯৫০ সালে-৪ লাখ ৩০ হাজার, ১৯৬৫ সালে-১০ লাখ, ১৯৭৫-২৩ লাখ, ১৯৮৫-৪৯ লাখ, ১৯৮৯-৬৫ লাখ, ১৯৯৬-৮০ লাখ, ২০০০ সাল- সম্ভাব্য ১ কোটি ১১ লাখ। ১৯৮৫ সালে বিশ্বব্যাংকের এক হিসাব মতে নগরায়নের ফলে ২০০০ সালে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ২৬%, ২০১৫ সালে ৩৭% এবং ২০২৫ সালে ৪৫-৫০% লোক শহরে বাস করবে। এই হিসাবেই দেখা যায় ২০২৫ সালে বাংলাদেশের শহরে বসবাসকারী জনসংখ্যার ১/৩ অংশ ঢাকা মহানগরীতে বসবাস করবে। সারণী -১ এ ১৯৫১ সাল থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত ঢাকা মহানগরীর জনসংখ্যা আয়তন ও জনসংখ্যার ঘনত্ব দেখানো হল ।

সারণী-১ : জনসংখ্যা /ঢাকার আয়তনঃ ১৯৫১-২০২৫ ।

বৎসর	জনসংখ্যা	আয়তন (বর্গমাইল)	ঘনত্ব (জনসংখ্যা/বর্গমাইল
১৯৫১	৩৩৫৯২৮	২৮	১১৯৯৭
১৯৬১	৫৫০১৪৩	৩৫	১৫৭১৮
১৯৭৪	১৬০৭৪৯৫	১২৫	১২৮৬০
১৯৮১	৩৪৪০১৪৭	১৫৫	২১৯৩৫
১৯৮৯	৫৫০০০০০	১৫৫	৩৫৪৮৪
২০০১	৮৪০০০০০	১৫৫	৫৪১৯৪
২০২৫ (ক)	১২৫০০০০০ ১৫০০০০০০	১৫৫	৪০৬৪৫-৭৭৪
(খ)	২০০০০০০০ ৩০০০০০০০	২০০-৩০০	১০০০০০-১২০০০০
(গ)	২০০০০০০০ ৩০০০০০০০	৬০০ গ্রামের আয়তনসহ	৩৩৩৩৩-৫০০০০

উৎস: : Islam, N 1996 "Dhaka: From City to Megacity", Dhaka, Urban studies programme, Department of Geography, University of Dhaka.PP:214.

৪.০ বায়ু দূষণ

নগরায়ন ও মোটরযান পরিবহণ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত । ঢাকা শহরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে সাম্প্রতিক কালে মোটরযান পরিবহণ বৃদ্ধি পেয়েছে । ১৯৮২ সাল থেকে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত পরিবেশ অধিদপ্তর ঢাকাসহ দেশের মোট ছয়টি শহরে

দূষণ নির্গমনকারী মোটরযানের একটি অনিয়মিত জরিপ গ্রহণ করে। এই জরিপে চট্রগ্রাম, খুলনা, বগুড়া, পাবনা ও দিনাজপুরে বিভিন্ন প্রকারের সর্বমোট ১৯,৭৫৭টি মোটরযান পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষীত মোটরযানসমূহের মধ্যে ১৩,৩০৮টি (৬৭.৪%) দূষক নির্গমন করছিল এবং তার অর্ধেকের বেশী ছিল ট্রাক ও তার পরবর্তী স্থানে ছিল মিনিবাস (সারণী-২) । ১৯৯০ সালের প্রথমার্ধে (জানুয়ারী-জুন) পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক সম্পাদিত ঢাকা শহরের বায়ুদূষণ সম্পর্কীয় এক জরিপ অনুষ্ঠিত হয় । এই জরিপ একটি বিদেশী কনসালটেন্ট- এর দ্বারা পরিচালিত হয় এবং বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে এতে সালফার ডায়অক্সাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইডসমূহ এবং ভাসমান বস্তুকণাসমূহের পরিমাপ করা হয় (Bashar and Reazuddin, 1990)। এই জরিপ ঢাকা শহরের তিনটি এলাকা বাতাসের নমুনা গ্রহণের উদ্দেশ্যে নির্বাচন করা হয়। এই এলাকাগুলো হচ্ছে ঃ

- মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা
- লালমাটিয়া আবাসিক এলাকা এবং
- তেজগাঁও শিল্প এলাকা

সারণী -২ : মোটরযানের নমুনা ।

মোটরযানের নমুনা	শতকরা হার
ট্রাক	৫১.৮
মিনিবাস	২৬.৯
বাস	৯.৫
বেবীট্যাক্সি	৪.৯
সেলুনকার	১.৫
মোটর সাইকেল	১.৫
অন্যান্য	৩.৯
মোট	১০০.০

উৎস : পরিবেশ অধিদপ্তর, ১৯৯০ ।

ছয় মাস ব্যাপী এই জরিপে, প্রতি মাসে প্রতি এলাকা থেকে বায়ুর নমুনা সংগ্রহ করে উপরে উল্লিখিত দূষকসমূহের পরিমাপ করা হয় এবং দূষকের পরিমাণ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) কর্তৃক নির্দিষ্ট আন্তর্জাতিক মানের সাথে তুলনা করা হয় । এই জরিপে দেখা যায় যে, শুষ্ক মৌসুমে, অর্থাৎ জানুয়ারী থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত

সময়ে তিনটি এলাকাতেই ভাসমান বস্তুকণার পরিমাণ বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক অনুমোদিত গড় পরিমাণ (৬০-৯০ মাইক্রোগ্রাম/ঘনমিটার) অপেক্ষা অধিক ছিল। আপেক্ষিকভাবে মতিঝিল ও তেজগাঁও এলাকায় বস্তুকণার পরিমাণ লালমাটিয়া অপেক্ষা বেশী ছিল। বস্তুতপক্ষে, জানুয়ারী মাসে মতিঝিলের বায়ুতে ভাসমান বস্তুকণার পরিমাণ ছিল প্রতি ঘন মিটারে ৫৭০ মাইক্রোগ্রাম। মে মাস থেকে বায়ুর গতিবেগ বৃদ্ধি এবং বৃষ্টিপাত শুরু হওয়ায় বস্তুকণায় পরিমাণ হ্রাস পেতে থাকে এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা দ্বারা নির্দিষ্ট উপরের সীমায় নিকট চলে আসে। বাণিজ্যিক ও শিল্প এলাকায় ভাসমান বস্তুকণার আধিক্য অধিকসংখ্যক মোটরযান পরিবহণের কারণে ঘটেছে এবং তার সাথে ঐ সকল এলাকায় নির্মাণাধীন বিল্ডিংসমূহ থেকেও প্রচুর বস্তুকণা বায়ুতে সংযোজিত হয়েছে। উল্লিখিত জরিপে সালফার ডায়অক্সাইড ও নাইট্রোজেন অক্সাইডের যে পরিমাণ পরিমাপ করা হয় তা অবশ্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা প্রদত্ত সীমারেখা অতিক্রম করে নাই। পরিবেশ অধিদপ্তর বাংলাদেশের জন্য কাল ধোঁয়া নির্গমনের সীমা নির্ধারণ করেছে ৬৫ এইচ,এস,ইউ* । পরীক্ষিত ৯০৮টি মোটরযানের মধ্যে মাত্র ১২৬টি (১৩.৯%) মোটরযান থেকে নির্গত ধোঁয়া এই সীমারেখা অতিক্রম করে নাই।

সারণী - ৩ : ঢাকা শহরের মোটরযান নির্গতকারী ধোঁয়া পরিমাপ, ১৯৯০

মোটরযান	সংখ্যা	< ৬৫	> ৬৫	>৭৫	>৯০	>১০০
	এইচ, এস,ইউ পরিমাণ ধোঁয়া নির্গতকারী মোটরযানের সংখ্যা					
বাস	২৮১	৪০	২৪১	৪০	৮৫	১১৬
মিনিবাস	৩০৬	৪৯	২৫৭	২৭	১০১	১২৯
ট্রাক	১৯৫	১৯	১৭৬	১১	৩৯	১২৬
টেম্পো	২৫	৫	২০	১	৪	১৫
জীপ	৪১	৩	৩৮	১	১৩	২৪
মাইক্রোবাস	৫৭	১০	৪৭	৩	১৪	৩০
পিক-আপ	৩	--	৩	--	--	৩

উৎস : পরিবেশ অধিদপ্তর, ১৯৯০।

প্রধান দূষণকারী মোটরযান হচ্ছে ট্রাক এবং বাস/মিনিবাস (সারণী - ৪) তবে দুই-স্ট্রোক ইঞ্জিন বিশিষ্ট বেবী ট্যাক্সি ও টেম্পোও প্রচুর সংখ্যায় দূষণকারীরূপে চিহ্নিত হয়। ঢাকা শহরে এত অধিক অনুপাতে কাল ধোঁয়া নির্গমনকারী মোটরযান রাস্তায় চলাচল করার ফলে প্রমাণ হয় যে, কার্বন মনোক্সাইডের দ্বারা ঢাকা নগরীর

* এইচ,এস,ইউ (H .S .U) – Hartridge Smoke Unit

বায়ু দূষণ এক ভয়াবহ পর্যায়ের দিকে এগুচ্ছে এবং একথা বলা যায় যে, নগরের জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং তার সাথে মোটরযানের সংখ্যাবৃদ্ধি ভবিষ্যৎ পরিস্থিতিকে আরও জটিলতর করবে ।

সারণী - ৪ : কাল ধোঁয়া নির্গমনকারী যান গণন ।

মোটরযান	গণনাকৃত যানের সংখ্যা	কাল ধোঁয়া নির্গমনকারী যান (শতকরা হার)
বাস/মিনিবাস	১২০	৮৫
ট্রাক	১২০	৮৮
প্রাইভেট গাড়ী	১২০	৪২
বেবী ট্যাক্সি	১২০	৮২
টেম্পো	১২০	৮৬
মোটরসাইকেল	১২০	৭২

উৎস : পরিবেশ অধিদপ্তর, ১৯৯২ ।

ভিয়েনা কেন্দ্রিক আন্তর্জাতিক সংস্থা ও বাংলাদেশ আনবিক শক্তি কমিশনের একটি সাম্প্রতিক গবেষণার ফলাফল থেকে এক ভয়াবহ তথ্য পাওয়া গেছে যে, ঢাকা এখন পৃথিবীর সবচেয়ে বিপজ্জনক নগরী। উল্লিখিত গবেষণা সমীক্ষায় দেখানো হয়েছে, ঢাকা মহানগরীতে বায়ু দূষণের পরিমাণ মেক্সিকো সিটির চেয়ে বেশী। এতদিন মেক্সিকো সিটিকে বিশ্বের সবচেয়ে পবিবেশগত বিপর্যয়কর মহানগরী হিসেবে বিবেচনা করা হতো। অথচ মেক্সিকো সিটিতে যেখানে প্রতি কিউবিক মিটার বাতাসে সীসার ঘনত্ব ৩৭৩ এনজি সেখানে ঢাকায়-এর পরিমাণ বর্তমানে ৪৬৯ এনজি। পরিবেশ অধিদপ্তরের ঢাকা বিভাগীয় দপ্তরের সর্বশেষ সীমিত মনিটরিং-এ ঢাকার প্রতি কিউবিক মিটার বাতাসে সীসার ঘনত্বের পরিমাণ থেকে যে চিত্র দেখা যাচ্ছে তা সারণী-৫-এ তুলে ধরা হল ।

সারণী-৫ : ঢাকার প্রতি কিউবিক মিটার বাতাসে সীসার ঘনত্বের পরিমাণ।

এলাকা	সালফার অক্সাইডের পরিমাণ	বাতাসে ভাসমান বস্তুকণা (প্রতি ঘনমিটার)	সহনীয় মাত্রা
ফার্মগেট, আসাদগেট		সহনীয় মাত্রার৪/৫ গুণ বেশি সালফার	৪০০ মাঃ গ্রাঃ প্রতি ঘনমিটারে
ফার্মগেট, আসাদগেট	৩ থেকে ৫ গুণ বেশি বিদ্যমান		১০০মাঃ গ্রাঃ প্রতি ঘনমিটারে

উৎস : পরিবেশ অধিদপ্তর, ১৯৯০ ।

এই মনিটরিংএ দেখা যায় দূর পাল্লার যানবাহন নির্গমন পথ, যেমনঃ ফার্মগেট ও আসাদগেট ইত্যাদি এলাকায় প্রতি ঘনমিটার বাতাসে ভাসমান বস্তুকণার (সাসপেন্ডেড পার্টিকুলেট মেটার) পরিমাণ সহনীয় মাত্রার (৪০০ মাঃ গ্রাঃ প্রতি ঘন মিটারে) ৪/৫ গুণ বেশি (সারণী - ৫) এবং সালফার অক্সাইডের পরিমাণ সহনীয় মাত্রার (১০০ মাঃ গ্রাঃ প্রতি ঘন মিটারে) ৩ থেকে ৫ গুণ বেশি বিদ্যমান থাকছে। অন্যদিকে নাইট্রোজেন অক্সাইডের পরিমাণ সহনীয় মাত্রার চেয়ে কম । বাণিজ্যিক এলাকাসমূহে, গুলিস্তান, পল্টন ও মতিঝিল ইত্যাদি এলাকায় বায়ু দূষণের মাত্রা মিরপুর রোডের চেয়ে তুলনামূলকভাবে কম। তবে সর্বত্রই সহনীয় মাত্রার ২/৩ গুণ বেশি । লক্ষণীয় বিষয় হলো, এই মনিটরিং - এ তেজগাঁও শিল্প এলাকার বাতাসে সাসপেন্ডেড পার্টিকুলেট মেটারের পরিমাণ যে এলাকায় যানবাহন বেশি চলাচল করে তার চেয়ে বেশ কম । এ থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় যে, ঢাকার সাম্প্রতিক বায়ু দূষণের জন্য দায়ী মূলত যানবাহন । ঢাকা মহানগরীর বাতাস কত বিষাক্ত তা এ উদাহরণ থেকে বোঝা যায় ঢাকার রাজউকের সামনে বাতাসে সালফার ডাই অক্সাইডের ঘনীভবন ৪৪১.৬৭ ইউজি/এম^{৩} এসে দাঁড়িয়েছে । অবশ্য ফার্মগেটে এলাকায় ঘনীভবন ৫৪০.৯৮ ইউজি/এম^{৩} (পরিবেশবাদী সংগঠন সুন্দরভূবন, ২০০২ইং) ।

৪.১ বায়ু দূষণের কারণ

ঢাকার বায়ু দূষণে নিচের কারণগুলো দেখা যায় ।

- যানবাহনের কালো ধোঁয়া ঢাকা মহানগরীর পরিবেশ দূষণের একটি প্রধান কারণ। সায়েদাবাদ, গাবতলী, মহাখালী, তেজগাঁ, ও গুলিস্তানসহ নগরীর বিভিন্ন টার্মিনাল, অনেকগুলো পেট্রোলপাম্প ও সার্ভিস ষ্টেশনে একদল টোকাই সর্বদা পরিত্যক্ত মবিল সংগ্রহ করে বাস, কিংবা মোটর গাড়ি থেকে । সংগৃহীত এই ‘পোড়া মবিল’ চলে যায় ‘মবিল প্রক্রিয়াকরণ’ এলাকায় । তারপর এই ‘দ্বিতীয় প্রজন্মের মবিল’ ক্রেতা সাধারণকে গছিয়ে দেয়া হচ্ছে । পোড়া মবিলের গাড়িটি কালো ধোঁয়া উদগীরণ করে ছুটে চলেছে ঢাকার বুকে । দূষিত হচ্ছে বায়ু । বিশ্বব্যাংকের সাম্প্রতিক এক রিপোর্টে ঢাকার বাতাসে সিসার পরিমাণ বর্তমান বিশ্বে সর্বোচ্চ বলে দেখানো হয়েছে । দেশের ৪ লাখ যানবাহনের যে পৌনে ২ লাখ যানবাহন ঢাকা শহরে চলাচল করে সেগুলোই মূলত এই বায়ু দূষণের

মূল উৎস । ঢাকার রাজপথে চলমান যানবাহনের চারটি শ্রেণী রয়েছে । এর মধ্যে এক একটা শ্রেণী ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বাতাসের ক্ষতি করে। যেমন :-

১. রিকশা ও ভ্যানগাড়ি হলো পরিবেশ সহায়ক ।

২. মিশুক, মোটর সাইকেল, বেবিট্যাক্সি ও টেম্পো বায়ু দূষণের জন্য প্রধানত দায়ী ।

৩. মোটরগাড়ির গড় দূষণ টেম্পো স্কুটারের চেয়ে কম হলেও সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে দূষণে এদের অবদান অনেক ।

৪. কারিগরী দিক থেকে ডিজেল ইঞ্জিনের বাস ও ট্রাক কম ক্ষতিকর হওয়ার কথা থাকলেও মূলত রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে এরাও বায়ুদূষণে ভাল ভূমিকা রেখে চলেছে ।

- মূলত সড়ক যন্ত্রযান এবং শিল্প কারখানা থেকে নির্গত কালো ধোঁয়া বায়ু দূষণের অন্যতম কারণ । এরাই বাতাসে সীসা ছড়াচ্ছে । প্রতিরোধ আইন থাকা সত্বেও শহরে প্রতিদিন হাজার হাজার বাস, ট্রাক, লরি, জীপ, কার, মাইক্রোবাস, অটোরিক্সা অবাধে কাল ধোঁয়া নিঃসরণ করে পরিবেশকে দূষিত করছে । বিশেষ করে হাজার হাজার অটোরিক্সা জ্বালানি হিসেবে লুব্রিক্যান্ট অয়েলের সাথে কেরোসিনের মিশ্রণ ঘটানোর ফলে এ থেকে চরম বিপজ্জনক মাত্রার সীমা নিঃসরিত হচ্ছে এবং বায়ু দূষিত হচ্ছে ।

- বাংলাদেশে পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধের জন্য সে সব আইন হয়েছে তার সঠিক প্রয়োগ না থাকার কারণে বায়ু দূষণ বাড়ছে। আইনগুলোর কোন প্রয়োগ নেই। পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধের জন্য আইন প্রয়োগের সঙ্গে বাংলাদেশে সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বি,আর,টি,এ), ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডি,এম,পি) ও পরিবেশ অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট। এখানে উল্লেখ্য যে, তিনটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কোনো সমন্বয় নেই।যার ফলে বায়ু দূষণ বাড়ছে। সারণী-৬-এ বায়ু দূষক, উৎস ও বায়ু দূষণের প্রভাব দেখানো হল।

- ঢাকার বায়ু দূষণের জন্য ঢাকার চারপাশ্বের ইটের ভাটা থেকে নির্গত ধোঁয়া,গৃহস্থালীতে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের জ্বালানীর ধোঁয়াও অনেক দায়ী।

সারণী - ৬ ঃ বায়ু দূষক, উৎস এবং বায়ু দূষণের প্রভাব ।

দূষকসমূহ	উৎস	প্রভাব
ভাসমান বস্তুকণা (SIM)	যান্ত্রিক যানবাহন, কাঠ-পুড়ানো শিল্পকারখানার কার্যক্রম	শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমন, গলার irritation, অ্যাজমা
সালফার ডাইঅক্সাইড	যানবাহন (ডিজেল ব্যবহার) ফ্যাক্টরী নির্গমন (emissions)	লাঙ্গের (lung) স্থায়ী ক্ষয় ও শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমন, ব্রনক্রাইটিস (Bronchitis) , ইমফেজেমিয়া (Emphysema), অ্যাজমা, উদ্ভিদের বৃদ্ধি হ্রাস, সিম ও টমেটোর স্পট
নাইট্রোজেন অক্সাইড	যান্ত্রিক যানবাহন পাওয়ার ষ্টেশন	শ্বাসতন্ত্রের রোগ, বক্ষব্যাধী, চোখের ইরিটেশন (irritation), মাথাব্যাথা, সিম ও টমেটোর স্পট
সীসা	উইন্ডালিন ডাষ্ট যানবাহণ, কয়লা ও কাঠ পুড়ানো ধাতু উৎপাদন, ফসফেট সার	কেন্দ্রিয় নার্ভ সিষ্টেমের সংক্রমন, উচ্চ রক্ত চাপ Renal Damage, পুর্নবয়স্কের চেয়ে শিশুর ৩ সারণী Risk এ গাছের উপর প্রভাব
কার্বন মনোক্সাইড	পেট্রোল যানবাহন (২ এবং ৩ হুইলারস্)	রক্তের অক্সিজেন পরিবহণ ক্ষমতা কমে যাওয়া Exacerbates heart Disorders
অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন	ডিজেল ইঞ্জিন এর নাপুড়ানো জ্বালানী	ঘুম ঘুম ভাব চোখ জ্বালা পোড়া
বেনজিন	Unleaded পেট্রোল	Carcinogens কেন্দ্রীয় নার্ভ সিষ্টেমের সংক্রমন
ওজন	সূর্যের উপস্থিতিতে এবং এর মধ্যে বিক্রিয়া	এর কার্যকরীতা হ্রাস অ্যাজমা

উৎস : UNEP 2001: State of the Environment – Bangladesh; UNEPRRC, AP Thailand.

৪.২ বায়ু দূষণে সৃষ্ট সমস্যা

ঢাকা মহানগরে বায়ু দূষণের সবচেয়ে মারাত্মক উপাদান হচ্ছে সীসা। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সাবেক পরিচালক ডাঃ রুহুল আমিন বলেন, সীসা এমন একটি মারাত্মক বিষাক্ত উপাদান যা সংক্রমনের ফলে মানুষের :-

১. ক্ষুধা ও যৌন ক্ষমতা লোপ পায় ।

২. শারীরিক দুর্বলতা, নিদ্রাহীনতা দেখা দেয় ।

৩. মাথা ধরা, মাথা ঘোরা বৃদ্ধি পায় ।

৪. চোখ জালা করে ।

৫. নাক দিয়ে পানি পড়ে ।

৬. বমি বমি ভাব, কাশি ইত্যাদি হয় ।

৭. শ্বাসকষ্ট, গলাব্যথা হয় ।

৮. রক্তশূন্যতা, ক্যান্সার দেখা দেয় ।

৯. হৃদরোগ এবং রক্ত প্রবাহে বিষক্রিয়ার মতো নানাবিধ সমস্যা দেখা দিতে পারে ।

উপরের স্বাস্থ্য সমস্যার জন্য এককভাবে শুধু সীসাই দায়ী নয়, কার্বনডাই অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড, সালফার ডাই অক্সাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইডও এর জন্য বহুলাংশে দায়ী । যুক্তরাষ্ট্রের একাডেমি অব সাইন্স-এর মতে শিশুদের রক্তে দশমিক ০৯ পিপিএস সীসার উপস্থিতি থাকলে তাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ চিরতরে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে । মেক্সিকো সিটির অধিবাসীদের রক্তে গড় সীসার উপস্থিতি দশমিক ২৩ । সেই হিসেবে ধরে নেয়া যায় আমাদের রক্রে সীসার উপস্থিতি মেক্সিকোর চেয়ে ভয়াবহ । ঢাকার অধিবাসীদের অবস্থা কতটা বিপজ্জনক তা আরো একটি তথ্য থেকে অনুমান করা যায় ভারতের দিল্লী মহানগরীতে বায়ু দূষণের কারণে ৭ হাজার লোকের মৃত্যু হয়েছে । ঢাকা মহানগরীতে বায়ু দূষণের কারণে আমাদের দেশে কতো লোক মারা যাচ্ছে তার কোন হিসাব করেনি কেউ । নগরীর বাতাসে অতি মাত্রায় ধুলির কারণে গত ২ বছরে এখানে হাঁপানি রোগীর সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে গেছে । ডাক্তারদের মতে, হাঁপানিতে আক্রান্ত শিশু রোগীর সংখ্যা ঢাকা শহরে দিন দিন বাড়ছে । ঢাকা শহর বায়ু দূষণে যে সত্যিই একটি গ্যাস চেম্বারে পরিণত হয়েছে ডাক্তারদের এই তথ্য সেই অভিমত সমর্থন করে । এদিকে প্রতি মাসেই ঢাকা নগরীতে হাঁপানি রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে । ঢাকাকে ধূলি ও ধোঁয়াশামুক্ত করতে না পারলে এ ব্যাপারে কোন উল্লেখযোগ্য ফল পাওয়া যাবে না। বিভিন্ন রোগের ফলে মানুষের উপর সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব পড়বে যা সামগ্রীক ভাবে দেশের উন্নয়ন প্রচেষ্টা ব্যাহত করবে । সারণী -৭-এ ঢাকা মহানগরীর বায়ু দূষণের কারণ, দূষক, ও দূষণের প্রভাব দেখানো হলো ।

সারণী - ৭ : বায়ু দূষণের কারণ ও বায়ু দূষক ও দূষণে সৃষ্ট সমস্যা ।

কারণ	দূষক	দূষণে সৃষ্ট সমস্যা
নগরায়ন	যানবাহন থেকে নির্গত ধোঁয়া বৃদ্ধি	নগরের বায়ুর গুণাগুণ হ্রাস
শিল্প দূষণ	SO2, NOy, Pax, গ্যাস ও বাষ্প নির্গমন	বায়ুর গুণাগুণ হ্রাস • মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর • উদ্ভিদের বংশ বৃদ্ধি ও গুণাগুণ ব্যাহত • ইকোসিষ্টেম ব্যাহত • বিল্ডিংয়ের উপাদানের ক্ষতি
যানবাহন থেকে নির্গমন	PM, CO, NOx, SO2, VOC	• মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর • উদ্ভিদের বংশ বৃদ্ধি ও গুণাগুণ ব্যাহত • ইকোসিষ্টেম ব্যহত • বিল্ডিংয়ের উপাদানের ক্ষতি
ইটের ভাটা	PM, CO, NOx, SO2	মানুষের স্বাস্থ্যের ক্ষতি
ইমারত নির্মাণ	PM	মানুষের স্বাস্থ্যের ক্ষতি
উন্মুক্ত বর্জ্য নিক্ষেপ	গ্যাস সমূহ বাষ্পঃ দুর্গন্ধ	বায়ুর গুণাগুণ হ্রাস
কাঠ/বায়োগ্যাস/কয়লা ব্যবহার	PM,VOC, SOx	মানুষের স্বাস্থ্যের ক্ষতি
জ্বালানীর গুণাগুণ	VOC+ অন্যান্য	মানুষের স্বাস্থ্যের ক্ষতি

উৎসঃ SOE Study Team

৪.৩ বায়ু দূষণ থেকে রক্ষার উপায়

ঢাকা মহানগরে বায়ু দূষণের প্রধান কারণ হলো যানবাহন । আর যানবাহন থেকে সৃষ্ট দূষণের কারণ গুলোর একটি হলো এর কারিগরী । মোটরগাড়ির ইঞ্জিন একটি

নির্দিষ্ট মাত্রার বায়ু দূষণ করবেই । কিন্তু আমাদের দেশে এর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে ত্রুটিযুক্ত জ্বালানি, পোড়া মবিলের অকার্যকরী জ্বালানীর ব্যবহার, ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত লোড চাপানো ও সর্বোপরি সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণের অভাব । জ্বালানীতে ভেজাল না মেশানো হলে, পাঁচ টনের অতিরিক্ত যাত্রী বা মাল বোঝাই না হলে টেকনিক্যাল দূষণ ছাড়া অতিরিক্ত দূষণ সহজে কমানো যায় । এ ক্ষেত্রে যানবাহনের সুষ্ঠ রক্ষণাবেক্ষণও পরিবেশকে সহনীয় রাখতে অনেকাংশে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে সক্ষম । ঢাকা শহরকে বায়ু দূষণের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্হাগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে ।

- সুষ্ঠু ট্রাফিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা ও যানবহনের ফিটনেসের যথাযথ তদারকী করা।
- ইটের ভাটায় ইট পোড়ানোতে কাঠের বদলে গ্যাসের ব্যবহার ।
- বর্জ্য আবর্জনার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ।
- শিল্প কারখানা থেকে নির্গত ক্ষতিকারক গ্যাসের নিয়ন্ত্রণ ।
- রাস্তাঘাট ধুলাবালি মুক্ত করা ।
- পরিকল্পিত নগরায়ন, জনসচেতনতা ও পরিবেশ আইন যথাযথ মেনে চলা ইত্যাদি ।

৫.০ পানি দূষণ

ঢাকা শহরে বর্তমানে পানিদূষণ পরিস্থিতি ভয়াবহ পর্যায়ে উপনীত । ওয়াসা কর্তৃক সাপ্লাইকৃত পানি ধীরে ধীরে খাওয়ার অযোগ্য হয়ে পড়ছে । বিভিন্ন সময় ওয়াসার পানির সাথে কেঁচো, সাপ, শেওলা, নদীর ঘোলা পানি, এমনকি সুয়ারেজ লাইনের ময়লা পাওয়ার সংবাদও পত্রিকাতে প্রকাশ হয়ে আসছে । নগরীর লক্ষ লক্ষ টন ময়লা আবর্জনা প্রতিদিন বুড়িগঙ্গা নদীতে পানির সাথে মিশছে । এ ছাড়াও শিল্প কারখানা থেকে প্রতিদিন হাজার হাজার ঘনমিটার উচ্চ মাত্রার দূষিত বর্জ্য ঢাকার আশপাশের নদীতে মিশ্রিত হচ্ছে (সারণী-৮)।

সারণী-৮ : প্রতিদিন বুড়িগঙ্গা নদীর পানিতে মিশ্রিত দূষিত বর্জ্যের পরিমাণ ।

শিল্প কারখানার অঞ্চল	দূষিত বর্জ্যের পরিমাণ
হাজারীবাগের ট্যানারী	প্রতিদিন ২০ হাজার ঘনমিটার
তেজগাঁও শিল্প এলাকা	প্রতিদিন ৫ হাজার ঘনমিটার
নারায়ণগঞ্জের শিল্প কারখানা	প্রতিদিন ৩ হাজার ঘনমিটার

উৎস : পরিবেশ অধিদপ্তর, ২০০০ ।

ঢাকার পাগলা পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা আমাদের দেশের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো কিন্তু বর্তমানে ঢাকা ওয়াসার পাগলা পয়ঃপরিশোধন কেন্দ্র কাজ করে না যার ফলে পয়ঃনিস্কাশন থেকে ঢাকার পানি দূষিত হচ্ছে। পুরোনো ঢাকায় প্রায় ১৫ হাজার কাঁচা পায়খান রয়েছে যাদের বর্জ্য বুড়িগঙ্গায় মিশছে এবং ঢাকার ভূগর্ভস্হ, ডোবা ও নালার পানিকে দূষিত করছে। শহরের ময়লা-আবর্জনা সরাসরি বুড়িগঙ্গা নদীতে ফেলা হয়। ঢাকার বিভিন্ন নলকূপ থেকে সরবরাহকৃত পানিতে ক্ষতিকর কলিফর্ম জীবাণু পাওয়া গেছে উল্লেখযোগ্য হারে। মিরপুর ৬নং সেকশনের ১৬নং পাম্প এবং এফডিসির পাম্পের পানি কলিফর্মের পরিমাণ প্রতি মিলি লিটারে ৩০-৩৫০টি। অথচ গ্রহণযোগ্য মাত্রা হলো ৪টি। অবশ্য কাকরাইল ও সায়েদাবাদ পাম্পের সরবরাহকৃত পানিতে কলিফর্মের মাত্রা গ্রহণযোগ্য। আবার ওয়াসার গভীর নলকূপগুলোর অধিকাংশগুলোতে ক্লোরিনেশন সেট নেই কিংবা অকেজো (পরিবেশ অধিদপ্তর)। পরিবেশ অধিদপ্তরের পুরোনো এক রিপোর্টে ওয়াসার পানিতে দস্তার পরিমাণ গ্রহণযোগ্য মানের চেয়ে বেশি বলা হয়েছে। তবে ওয়াসার পানিতে ক্যাডমিয়ামের পরিমাণ ১.০৩ থেকে ২.২৪ পিপিবি, যা গ্রহণযোগ্য মাত্রার অনেক কম। সারণী-৯ এ ঢাকাকে বেষ্টনকারী বিভিন্ন নদীর দূষণের কারণ ও মাত্রা দেখানো হল।

সারণী - ৯ : ঢাকার নদীসমূহের দূষণের কারণ ও দূষণের মাত্রা ।

নদীর নাম	দূষণের কারণ	মন্তব্য
বুড়িগঙ্গা	ঢাকার ময়লা আবর্জনা ও হাজারীবাগের ট্যানারী	সবচেয়ে বেশী দূষিত ঋতুভেদে দূষণের তারতম্য ব্যাপক
শিতলক্ষ্যা	ঘোড়াশাল ইউরিয়া সার কাখানা, তেল টার্মিনাল, নারায়নগঞ্জ ও ডেমরার শিল্প কারখানা	সবচেয়ে বেশী দূষিত ঋতুভেদে দূষণের তারতম্য আছে
বালু	তেজগাঁও ও টংগীর শিল্পকারখানা	ব্যাপক ভাবে দূষিত
তুরাগ	টংগী, সাভার ও মিরপুরের শিল্প স্থাপনা	দূষিত

উৎস : UNFP 2001.

সারণী - ১০ : পানি দূষণের কারণ, পানির অবস্থা ও পানি দূষণের প্রভাব।

দূষণের কারণ	অবস্থা	ফলাফল
• ইনডাষ্ট্রিয়াল Effluent • ট্যানারী, গার্মেন্টস, ঔষধ, প্রসাধন, অন্যান্য শিল্প • এগ্রোক্যামিক্যাল • নৌযান থেকে নির্গত তেল • পয়ঃনিষ্কাশনের পানি • শুষ্ক মৌসুমে নদীতে নিম্ন পানি প্রবাহ • জনসংখ্যার চাপ	• শুষ্ক মৌসুমে নদীর পানির গুণাগুন হ্রাস • পানির দূষণ বৃদ্ধি	• নগরের পানির উৎসের উপর চাপ । • পোনা মাছের মরণবৃদ্ধি, মাছের গমনাগমন হ্রাস ও মাছের গুণাগুন হ্রাস। • মাছের আবাসস্হলের গুণাগুন হ্রাস । • মাটির উৎপাদন হ্রাস । • জলজ ইকোসিষ্টেম ব্যহত । • পানিবাহিত রোগের প্রকোপের সম্ভাব্য বৃদ্ধি। • সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা ।

উৎস : : SOE Study Team

৫.১ পানি দুণের কারণ

ঢকার পানি দূষণের কারণগুলো আলোচনা করলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোকে ঢাকার পানি দূষণের জন্য দায়ী করা যায় :-

- ট্যানারী থেকে নির্গত বিষাক্ত পদার্থ ।
- গার্মেন্টস, ডাইং ও শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে নির্গত মারাত্মক দূষণীয় রাসায়নিক পদার্থ ।
- পয়ঃনিষ্কাশনের ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থা থেকে নির্গত বর্জ্য পদার্থ ।
- গৃহস্থালীর ও হাট বাজার থেকে নির্গত ময়লা আবর্জনা ইত্যাদি ।

৫.২ পানি দূষণে সৃষ্ট সমস্যা

ঢাকার পানি দূষণের ফলে যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তা হল :-

- বিপুল পরিমাণ বিষাক্ত পানি বুড়িগঙ্গার পানির সাথে মিশে নদীর পানির সলিডিটি বেড়ে গেছে ।
- নদীর পানিতে অক্সিজেনের পরিমাণ অনেক কমে গেছে । যেখানে প্রাণের অস্তিত্বের জন্য নদীর পানির সাথে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ প্রতি লিটার সর্বনিম্ন ৬ মিঃ গ্রাম, সেখানে বুড়িগঙ্গা নদীতে এর পরিমাণ মাত্র ২মিঃ গ্রামে এসে পৌঁছেছে ।
- ঢাকা থেকে নারায়ণগঞ্জ পর্যন্ত বিস্তৃত নদীর পানিতে শুষ্ক মৌসুমে কোন জলজপ্রাণী বাঁচতে পারে না বলে প্রাণী বিজ্ঞানীরা শংকা প্রকাশ করেছেন ।
- পানি বাহিত রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়েছে ।

৫.৩ পানি দূষণ থেকে রক্ষার উপায়

ঢাকার পানি দূষণ রোধ করার জন্য নিচের ব্যবস্হাগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে :-

ট্যানারী স্থানান্তর করা ।

- পানি ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপন ।
- সুষ্ঠু পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা গড়ে তোলা ।
- পরিবেশ আইন যথাযথ ভাবে মেনে চলা ।
- সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয় সাধন ।
- শিল্প বর্জ্য নিয়ন্ত্রণ করা ও
- গণ সচেতনতা ইত্যাদি ।

৬.১ শব্দ দূষণ

বায়ু দূষণের পাশাপাশি মহানগরীতে শব্দ দূষণ ভয়াবহ স্তরে পৌঁছেছে । শব্দ দূষণের ভয়াবহতা বায়ু দূষণের চেয়ে কম নয় । বিভিন্ন ভাবে সৃষ্ট এই শব্দ দূষণের ফলে নগরবাসী বিভিন্ন ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে প্রতিনিয়ত ডাক্তারের শরণাপন্ন হচ্ছে। ঢাকায় বায়ু কিংবা পানির মতো এর কোলাহলও মারাত্মক দূষণে দূষিত । ঢাকার মানুষ প্রতিনিয়ত যে তীব্র শব্দে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন তা হলো

গাড়ির হর্ন। বিশেষজ্ঞদের মতে মানুষের স্বাভাবিক শ্রবণশক্তি সীমা ৬০ -৬৫ ডেসিবেল। আর ঢাকা শহরে শব্দের গড়মাত্রা ১০০-১১০ ডেসিবেল । বছর পাঁচেক আগে ১৯৯৭ সালে ঢাকা মহানগরীতে শব্দ দূষণ বিষয়ে পরিবেশ অধিদপ্তরের উদ্যোগে একটি জরিপ পরিচালিত হয়েছিল । উল্লিখিত জরীপে দিন ও রাতে ঢাকার বিভিন্ন স্হানের শব্দের মাত্রা ধারণ করা হয় (সারণী -১১) ।

সারণী - ১১ : স্হান ও সময় অনুযায়ী শব্দের সহনীয় মাত্রা

ক্রমিক নং	এলাকার শ্রেণী	ডেসিবল এককে ধার্যকৃত সীমা	
		দিন (সকাল ৬টা-রাত ৯টা)	রাত (৯টা-ভোর ৬টা)
ক।	নীরব এলাকা	৪৫	৩৫
খ।	আবাসিক এলাকা	৫০	৪০
গ।	মিশ্র এলাকা (আ/এ, শিল্প বা/এ)	৬০	৫০
ঘ।	বাণিজ্যিক এলাকা	৭০	৬০
ঙ।	শিল্প এলাকা	৭৫	৭০

উৎস ঃ ওয়ার্ক ফর বেটার বাংলাদেশ, ২০০২ ।

জরিপকৃত তথ্য থেকে তখন জানা গিয়েছিল, নগরীতে শব্দের দূষণমাত্রা সর্বোচ্চ ৭৫ ডেসিবল এবং গড়ে ৬৭ ডেসিবল । ঢাকার হাসপাতাল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শব্দের গ্রহণমাত্রা শিল্প এলাকার গ্রহণযোগ্য মাত্রার চেয়ে কয়েক গুণ বেশি । শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও হাসপাতাল এলাকায় দিনের বেলায় শব্দের গ্রহণযোগ্য মাত্রা ৪৫ ডেসিবল (সারণী-১১) । কিন্তু এসব এলাকায় শব্দের সর্বোচ্চ গড় মাত্রা হচ্ছে ৭০ থেকে ৭৫ ডেসিবল । বিজ্ঞানীদের মতে, মানুষের জন্য শব্দের সহনীয় মাত্রা হচ্ছে ৪৫ ডেসিবল । মানুষের স্বাভাবিক শব্দগ্রহণ ক্ষমতা ২০ থেকে ২ হাজার সাইকেল/সেকেন্ড অথচ গাড়ির হর্ন, বিশেষ করে হাইড্রলিক হর্নের শব্দের কম্পনমাত্রা হচ্ছে ২০ হাজার সাইকেল/সেকেন্ড । এই হাইড্রলিক হর্ণ ঢাকার শব্দ দূষণের প্রধান কারণ । শব্দ দূষণের ফলে বর্তমানে ছোট-বড় বিভিন্ন উপসর্গে আক্রান্ত নগরবাসীর সংখ্যা ১৭% । ১৯৯৭ সালের পর থেকে এ পর্যন্ত ঢাকার শব্দ দূষণ রোধে কোন প্রতিকার বা প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়নি । দূষণ সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে আইনগত কোন ধরনের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে বলেও জানা

যায়নি । সুতরাং ৫ বছর পর এই ২০০৩ সালের পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ পর্যায়ে গিয়ে পৌছবে এমন আশঙ্কা করা নিশ্চই অমূলক হবে না । পরিবেশ দূষণ, বিশেষ করে পানি, বাতাস ও মাটি (পলিথিনের কারণে) দূষণের বিরুদ্ধে ঢাকার নাগরিকগণ যে পরিমাণ শঙ্কিত, সতর্ক ও সোচ্চার হয়ে উঠেছেন শব্দদূষণের ক্ষেত্রে ঠিক ততটাই নিঃশঙ্ক, নিরুদ্বেগ ও নির্লিপ্ত রয়েছেন বলে মনে হয় । চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের মতে, মানুষের এক নম্বর শত্রু হচ্ছে হাইড্রোলিক হর্ন । শব্দ যেমন মানুষকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে, আনন্দ দিতে পারে, তেমনি বিরক্তি উৎপাদন করতে পারে, শারীরিক ও মানসিক বিপর্যয়ের কারণও হতে পারে ।

৬.১ শব্দ দূষণের কারণ

ঢাকা মহানগরীতে শব্দ দূষণের বিভিন্ন কারণ রয়েছে। এর মধ্যে :-

- গাড়ীর হাইড্রলিক হর্ণ প্রধান । ঢাকায় ভয়ঙ্কর হাইড্রলিক হর্ন বাজাতে বাজাতে চলাচল করছে লক্ষাধিক যানবাহন । যা মানুষের গ্রহণযোগ্য মাত্রার চেয়ে ৩৩ শতাংশ বেশী। পথে পথে মোড়ে মোড়ে নানা যানবাহনের বিরক্তিকর শব্দ এবং হর্ণের আওয়াজই মূলত ঢাকার শব্দদূষণের প্রধান কারণ। রাজধানীতে হাইড্রলিক হর্ণের বিরুদ্ধে একাধিক সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হলেও এর ব্যবহার এখনো বন্ধ করা যায়নি। রেলগাড়ি, ভারি যানবাহন, জেনারেটর, মাইক, সাইরেন, কলকারখানা, নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের মেশিন, গাড়ির হর্ন, গৃহস্থালী কাজে ব্যবহৃত ভ্যাকুয়াম ক্লিনার, ব্লেন্ডার মেশিন, বৈদ্যুতিক ছুরিসহ বহু আধুনিক যন্ত্রপাতিও ঢাকার শব্দ দূষণের কারণ।
- ঢাকায় গাড়ীর অত্যধিক হর্ণ বাজানো শব্দ দূষণের অন্যতম কারণ। অন্যান্য যে কোনো শহরের তুলনায় ঢাকার চালকরা হর্ণ বাজান বেশি। রাজপথ ব্যবহারকারীদের ট্রাফিক আইন মেনে না চলাটাই বেশি বেশি হর্ণ বাজানোর জন্য দায়ী । ঢাকার পথচারীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়ে জেব্রা ক্রসিং দিয়ে রাস্তা পারাপার হন না । হঠাৎ করে দৌড় দিয়ে রাস্তা পার হতে চান । রিক্সা ও স্কুটারগুলো কোন রকম সতর্কীকরণ ছাড়াই নিজেদের ট্রাক ছেড়ে দ্রুতযানের ট্রাকে ঢুকে পড়ে । অধিকাংশ চালকই নিজের হাত ও বাতির সঠিক ব্যবহার করেন না ফলে জান বাচানোর জন্য হর্ণের উপর হাত দিয়ে রাখা ছাড়া চালকদের কোন গত্যন্তর থাকে না । ফলে শব্দ দূষণের সৃষ্টি হয় ।

- শব্দবর্ধক যন্ত্রের সাহায্যে বিভিন্ন শব্দযন্ত্রের গগনবিদারী চিৎকার ঢাকার শব্দ দূষণের আরেকটি কারণ। যেখানে সেখানে উচ্চস্বরে মাইক বাজানোও শব্দ দূষণের অন্যতম কারণ ।

৬.২ শব্দ দূষণে সৃষ্ট সমস্যা

শব্দ দূষণের বিরূপ প্রতিক্রিয়ায় ঢাকাবাসী বিভিন্ন ধরনের শারীরিক ও মানসিক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন । সমস্যাগুলো নিচে আলোচনা করা হলো ।

- শব্দ দূষণ মহানগরীতে বধিরতার হার বৃদ্ধি করছে । অসহনীয় শব্দকম্পনাঙ্কের কারণে শ্রবণেন্দ্রিয়ের সিলিয়ারগুলো ক্রমশ অকেজো হয়ে পড়তে থাকে । প্রথমে কানে শোনার মাত্রা কম হলেও এক পর্যায়ে মানুষ চিরতরে বধির হয়ে যায় । এমনকি কানের পর্দা ফেটেও য়েতে পারে । নষ্ট হয়ে যায় মানুষের শ্রবণশক্তি । আর একবার যদি শ্রবণশক্তির নষ্ট হয়ে যায় তবে তা চিকিৎসা করে সারিয়ে তোলা অসম্ভব হয়ে পড়ে । শব্দ দূষণের কারণে শুধু বধির হওয়া কিংবা চিরতরে শ্রবণযন্ত্র নষ্ট হওয়াই নয়-দূষণ সৃষ্টি করে আরও হাজারো পারিবারিক ও সামাজিক সমস্যা ।
- শব্দ দূষণের ফলে হৃদরোগে আক্রান্তদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে । বহু বছরের গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষায় বিজ্ঞানীরা প্রমাণ পেয়েছেন, হৃদরোগের অন্যতম কারণ হচ্ছে শব্দ দূষণ । তীব্র শব্দ কেন্দ্রিয় স্নায়ুতন্ত্রকে উত্তেজিত করে তোলে । এতে করে পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হরমোন রক্তে কোলেস্টোরলের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়, যা শেষ পর্যন্ত হৃদরোগের জন্য দায়ী ।
- শব্দ দূষণের ফলে ধমনীর কাঠিন্য রোগের সৃষ্টি করে । উচ্চ শব্দে হৃদকম্পন বেড়ে যায় । ফলে হৃৎপিন্ডে ফাটল ধরতে পারে । একই কারণে মস্তিস্কে ঝাঁকুনি লেগে অভ্যন্তরীণ রক্তপাত হওয়ার আশঙ্কা থাকে । উচ্চ শব্দে নিউরো কোষ ভেঙ্গে গিয়ে হাড়ে ফাটল হতে পারে । তাছাড়া লিভার, পাকস্থলী ও প্লীহার জন্যও উচ্চ শব্দ ক্ষতিকর ।
- শব্দ দূষণের ফলে বদহজম, পেপটিক, আলসার, মাথা ঝিমঝিম করা, চিরস্থায়ী মাথা ব্যথা, এ্যাজমাসহ মানসিক চাপের সৃষ্টি হতে পারে । শব্দদূষণের কারণে রক্তরসে বা প্লাজমীয় এ্যাডরেনাল নামক এক ধরনের হরমোন ক্ষরণ বেড়ে যায় । ফলে হৃদস্পন্দন ও রক্তচাপ

বৃদ্ধি পায়। উচ্চ শব্দে রক্তনালীগুলো সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে, ত্বক ফ্যাকাশে হয়ে যায় এবং মাংসপেশী উত্তেজনায় কঠিন হয়ে পড়ে ।

- শব্দ দূষণে আক্রান্ত হন গর্ভবতী মায়েরাও । প্রচন্ড শব্দে গর্ভপাত ঘটার আশঙ্কাও রয়েছে । গর্ভজাত সন্তান উচ্চ শব্দের কারণে বধির হয়ে জন্ম নিতে পারে ।
- শব্দ দূষণ ভয়াবহ মানসিক রোগেরও সৃষ্টি করতে পারে । তীব্র শব্দে রক্তে এ্যাডরেনাল হরমোন নিঃসরণ বেড়ে গেলে মানসিক অস্থিরতা ও স্নায়বিক উত্তেজনা বাড়িয়ে দেয় । ফলে দুর্বলতা, বিরক্তি, ক্রোধ, উদ্বিগ্নতা, হতাশা, টেনশন, উত্তেজনা, অবসাদ ইত্যাদি মানসিক রোগের সৃষ্টি হতে পারে । শব্দদূষণ থেকে সৃষ্ট মানসিক চাপ খুব সহজেই আত্মহত্যার প্রবণতায় আক্রান্ত করতে পারে ।
- স্বাভাবিক কাজকর্মে উৎকট শব্দ বাধার সৃষ্টি করে এবং বিরক্তি ও উত্তেজিত করে তোলে । শিশু ও রোগীদের জন্য শব্দদূষণ মারাত্মক পরিণতি ডেকে আনতে পারে । শব্দ দূষণের কারণে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ায় মনোযোগী হতে না পারার সমস্যা দেখা দেয় ।

৬.৩ শব্দ দূষণ থেকে রক্ষার উপায়

ঢাকার শব্দ দূষণ হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য নিচের ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে :-

- হাইড্রলিক হর্ণের উৎখাতের পাশাপাশি ট্রাফিক আইনের ব্যাপারে সচেতনতা বৃদ্ধিই কেবল ঢাকার শব্দ দূষণ গ্রহণযোগ্য মাত্রায় নামিয়ে আনতে পারে ।
- পরিবেশ আইন যথাযথ ভাবে মেনে চলা ।
- সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয় সাধন, সামাজিক ও গণ সচেতনতা শব্দদুষণ রোধ করতে পারে ।

৭.০ ময়লা আবর্জনা দূষণ

ঢাকার অধিকাংশ এলাকায় ছড়িয়ে থাকে ময়লা আবর্জনা, ম্যানহোলের উপচেপড়া পয়ঃবর্জ্যে ঢাকায় টেকা দায় । ছড়ানো ছিটানো ময়লা আবর্জনার গন্ধে ঢাকার

অধিকাংশ এলাকায় আজকাল স্বাভাবিকভাবে হাঁটাচলারও উপায় নেই । কোন কোন এলাকার ফুটপাথগুলো পরিণত হয়েছে রীতিমতো ময়লার ভাগাড়ে। পাড়া-মহল্লাগুলোতে এখন আর ডিসিসির ক্লিনারদের তেমন দেখা যায় না। অগত্যা নগরীর প্রায় সব এলাকার বাসিন্দাই নিজেদের ব্যবস্থাপনায় বাড়িঘরের আবর্জনা সিটি কর্পোরেশনের ডাষ্টবিন বা গার্বেজ কন্টেনারে ফেলে আসেন । কিন্তু সেখান থেকেও ময়লা-আবর্জনা ঠিকমতো সরানো হয় না । অধিকাংশ ডাষ্টবিন ও গার্বেজ কন্টেনারে প্রায় সব সময়ই ময়লার স্তূপ জমে থাকে । এসব দেখারও যেন কেউ নেই। যার ফলে ঢাকা শহর ময়লা আবর্জনার শহরে পরিণত হচ্ছে । ঢাকা শহরের লোকজনের তুলনায় ডিসিসির লোকবল ও সরঞ্জাম খুবই অপ্রতুল । এই অবস্থার জন্য ঢাকা শহরে ঠিকমত ময়লা আবর্জনা পরিস্কার হয় না ফলে ঢাকা শহরের ময়লা আবর্জনার দূষণ বাড়ছে। ময়লা ফেলার জন্য ডিসিসির লোকবল ও সরনযামের একটা চিত্র সারণী-১২ তে তুলে ধরা হল ।

সারণী-১২: রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় ময়লা আবর্জনা পরিস্কারে ডিসিসির লোকবল ও সরঞ্জাম ।

লোকবল ও সরঞ্জাম	সংখ্যা
ডাষ্টবিন	৪ হাজার
ডিমাউন্টেবল গার্বেজ কন্টেনার	৪২০টি
ট্রাক	২২৪টি
কন্টেনার ক্যারিয়ার	১২৮টি
ড্রাইভার	সাড়ে ৩শরও বেশী
হ্যান্ডট্রলি বা হাতগাড়ি	৩ হাজার
ক্লিনার	প্রায় ৭ হাজার

উৎস : ডিসিসি, ২০০২ ।

ঢাকার বিভিন্ন এলাকার অধিকাংশ ডাষ্টবিন এবং গার্বেজ কন্টেনারেই ময়লা-আবর্জনার স্তূপ । কোন কোন স্থানে দিনের বেলাতেই ট্রাকে তোলা হয় ময়লা । ফুটপাথে ময়লা-আবর্জনার কারণে মানুষ হাঁটতে পারছে না । উল্লেখ্য যে, নগরীতে দিনে ১০ লাখ ঘনমিটার পয়ঃবর্জ্য তৈরী হলেও মাত্র সোয়া লাখ ঘনমিটার নিস্কাশনের ক্ষমতা ওয়াসার রয়েছে । এ ক্ষমতারও মাত্র ৫০ শতাংশ ব্যবহার

করতে পারে ওয়াসা । এই অবস্থায় ঢাকা নগরীতে ২০১০ সালের পর সুস্থ মানুষ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হবে । ঢাকাতে শিল্পকারখানা, গৃহস্থালী ছাড়াও হাসপাতালগুলোর ব্যাপক ময়লা আবর্জনা উৎপাদন করছে । যাদের পরিবেশিক প্রভাব মারাত্মক । সারণী -১৩ তে ঢাকার হাসপাতাল ও ক্লিনিকগুলোর উৎপাদিত বর্জ্যের বিভাজন দেখানো হল ।

সারণী - ১৩ : হাসপাতালসমূহে উৎপাদিত বর্জ্যের বিভাজন ।

বর্জ্যের শ্রেণী	বর্জ্যের বিবরণ	উৎপাদনকারী
সাধারণ বর্জ্য	পেপারক্লথ,বাক্স,প্যাকিং, ঔষধ কনটেনার, পলিথিন এবং রান্না ঘরের আবর্জনা।	প্রশাসন /ল্যাবরেটরী
প্যাথলজিক্যাল বর্জ্য	টিস্যু, বিভিন্ন অঙ্গপ্রতঙ্গ, রক্ত	রোগী /ল্যাবরেটরী
ইনফেক্শন বর্জ্য	সার্জারীর বিভিন্ন উপাদান, ব্যন্ডেজ, প্লাস্টার ইত্যাদি	রোগী /ল্যাবরেটরী
সাইটোক্সক	তারিখ অতিক্রম হয়ে গেছে এমন ঔষধসমূহ	রোগী /ল্যাবরেটরী
ফার্মা ইলেকট্রিক্যাল	বিভিন্ন নিউক্লিয়ার মেডিসিন বর্জ্য, এক্সারে বর্জ, কঠিন, তরল, গ্যসীয় বর্জ্য ইত্যাদি	প্রশাসন/ ল্যাবরেটরী
ধারালো বর্জ্য	সুঁচ, সিরিঞ্জ, কঙ্কাল, ব্লেড, ভাঙ্গা গ্লাস, নখ ইত্যাদি	রোগী এবং ল্যাবরেটরী
তরল বর্জ্য,	তরল বর্জ্য রক্ত, পূঁজ, বমি, জীব শরীরের জলীয় তরল পদার্থ ইত্যাদি	রোগী, ল্যাবরেটরী, সেবা প্রদানকারী কর্মচারী

উৎস : বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা ষষ্ঠ বর্ষ সংখ্যা নভেম্বর ২০০১ হাসপাতালে বর্জ্য ব্যবস্থাপনাঃ তিনটি হাসপাতালের উপর একটি সমীক্ষা । সৈয়দা পাপিয়া নাহিদ পপি ও মহামায়া আচার্য্য।

৭.১ ময়লা আবর্জনা দূষণের কারণ

ঢাকার ময়লা আবর্জনা দূষণের কারণগুলো হল :-

- ডিসিসিতে ক্লিনাররা ময়লা আবর্জনা পরিস্কার না করে কাজে ফাঁকি দেয় । বিষয়টি অনেক পুরনো । কোন কোন অসৎ ইন্সপেক্টর এবং

ওয়ার্ড কমিশনারের সঙ্গে যোগসাজশের মাধ্যমে ক্লিনাররা কাজ না করে বিল হাতিয়ে নেয় বলে জানা গেছে । ফলে ময়লা আবর্জনা ডাষ্টবিনে থেকে যায় এবং পরিবেশ দূষণ হয় ।

- ময়লা আবর্জনা দূষণের জন্য ডিসিসির ড্রাইভাররাও দায়ী । ময়লা-আবর্জনা পরিস্কারের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় অভিযোগটি পাওয়া গেছে ডিসিসির ড্রাইভারদের বিরূদ্ধে। ট্রাকগুলোর প্রতিদিন ২ ট্রিপ করে এই কাজে সময় দেয়ার কথা থাকলেও দৈনিক এক ট্রিপের বেশি ময়লা টানা হয় না । যার ফলে ঢাকা শহর ময়লার স্তূপে পরিণত হচ্ছে ।
- অবৈধ দখলদারদের দৌরাত্ম্যে রাস্তা সঙ্কুচিত হওয়ার ব্যাপারও ময়লা আবর্জনা দূষণের কারণ । বাড়ি করার জন্য বিভিন্ন উপকরণ রাস্তায় ফেলে রাখা, বড় বড় গাড়ির গ্যারেজ না থাকায় রাস্তার পাশেই গ্যারেজ করা মানুষের আরও কষ্টের কারণ ।
- নগরীর স্যুয়ারেজ অবস্হা ভাল নয় এর ফলে ময়লা আবর্জনা দূষণ বাড়ছে । সুষ্ঠ পয়ঃনিস্কাষন ব্যবস্থার অভাবে নগরীতে ময়লা আবর্জনা দূষণ বাড়ছে ।
- ময়লা আবর্জনার কোন সুষ্ঠ ব্যবস্হাপনা না থাকার কারণও এ দূষণের জন্য দায়ী।
- বর্তমানে সবচেয়ে মারাত্মক ও ক্ষতিকারক বর্জ্য দূষণ হচ্ছে হাসপাতালের বর্জ্য। ঢাকাসহ সারাদেশের কোন হাসপাতাল বা ক্লিনিকে কোন ধরনের সুষ্ঠু বর্জ্য ব্যবস্হাপনা নেই যার ফলে বর্জ্য দূষণের সমস্যা দিন দিন বাড়ছে ।
- ঢাকার অতিরিক্ত জনসংখ্যা ।
- গণসচেতনতার অভাব ইত্যাদি ।

৭.২ ময়লা আবর্জনা দূষণে সৃষ্ট সমস্যা

ঢাকার ময়লা আবর্জনা দূষণের কারণে নিচের সমস্যাগুলো সৃষ্টি হচ্ছে:-

- ময়লা আবর্জনা দূষণে টাইফোয়েড, ডায়রিয়া, ডিসেন্ট্রি, বহুজাতের কৃমি, ভাইরালজন্ডিস সহ নানাবিধ পেটের পীড়া ছড়িয়ে পড়ছে ।

- স্বাস্থ্য সম্বন্ধ্যে ব্যাপক অজ্ঞতার কারণে পানি, খাদ্যসহ বিভিন্ন দ্রব্যের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মিশছে পয়ঃবর্জ্য ও ময়লা আবর্জনার বিভিন্ন ক্ষতিকারক উপাদান। এবং এর তাৎক্ষণিক ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকল বাসিন্দা ।
- ময়লা আবর্জনা পঁচে নগরীতে মশা-মাছির সৃষ্টি করেছে ।
- ময়লা আবর্জনা ডাষ্টবিন ছাড়াই ফেলার কারণে দুর্গন্ধে নগরজীবন অতিষ্ট হয়ে পড়েছে ।

৭.৩ ময়লা আবর্জনা দূষণ রক্ষার উপায়

ময়লা আবর্জনা দূষণ থেকে রক্ষার জন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে ঃ

- বাসাবাড়ির ময়লা রাতের বেলা ফেলার ব্যবস্হা করা যেতে পারে । এই আহবান জানালে সেই অনুরোধে সকলেই সাড়া দেবে। আসলে দিনের বেলা ময়লা ভর্তি ট্রাক কেউ দেখতে চায় না ।
- শিল্প এলাকার সলিড ও তরল বর্জ্য ট্রিটমেন্ট বা দূষণমুক্ত না করে পরিবেশে ছাড়া যাবে না ।
- ত্রুটিপূর্ণ যানবাহনের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে ।
- নিদিষ্ট স্থানে ময়লা আবর্জনা ফেলার ব্যবস্থা করতে হবে ।
- পলিথিন-প্লাষ্টিকের ব্যাগ বা অন্যান্য সামগ্রী ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে যাওয়ার পর তা যত্রতত্র নিক্ষেপের ফলে পয়ঃ নিস্কাশন নালা বন্ধ হয়ে শহরে জলাবদ্ধতা ও তজ্জনিত দূষণ সৃষ্টির কারণ হচ্ছে । পলিথিন-প্লাষ্টিকের বিকল্প ব্যাগ ব্যবহার করতে হবে অথবা এগুলো সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে ।
- সর্বোপরি ব্যাপক জনসচেতনতা ও আইনের সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে আমরা আমাদের বিপর্যস্ত মহানগরীকে ময়লা অবর্জনা পরিস্কার করে বসবাসের উপযুক্ত করতে সক্ষম হব ।

৮.০ এ্যাপার্টমেন্টের পারিবেশিক সমস্যা

ঢাকা শহরে আবাসন সমস্যার সমাধানে মূলতঃ অ্যাপার্টমেন্ট ব্যবসা শুরু হয় । এক্ষেত্রে বানিজ্যিক ভিত্তিতে অ্যাপার্টমেন্ট নির্মাণের ক্ষেত্রে নির্মাতাগণ তাদের

ব্যবসায়িক স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। যার প্রেক্ষিতে বেশ কিছু পারিবেশিক সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। পারিবেশিক এ সমস্যাবলীকে দুটি দৃষ্টিকোণ হতে দেখা যায় যথা ঃ-

- অ্যাপার্টমেন্টে অভ্যন্তরিণ গঠনগত সমস্যা ।
- অ্যাপার্টমেন্ট দ্বারা সৃষ্ট বাহ্যিক পারিবেশিক সমস্যা ।

৮.১ এ্যাপার্টমেন্টের আভ্যন্তরিণ গঠনগত সমস্যা

অ্যাপার্টমেন্ট নির্মাণে স্থাপত্যিক চিন্তার পাশাপাশি নগর পরিবেশ, নিজস্ব কাঠামো, অগ্নি, বিদ্যুৎ ও অন্যান্য দুর্ঘটনা হতে বাঁচার জন্য সতর্কতা অবলম্বন করতে হয় কিন্তু ঢাকা শহরের কেন্দ্রস্থলে গড়ে উঠা অ্যাপার্টমেন্টগুলোতে বেশ কিছু গঠনগত ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়েছে । যার ফলে অ্যাপার্টমেন্টবাসীগণ কিছু কিছু সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন । অ্যাপার্টমেন্টের গঠনগত সমস্যা তুলে ধরা হল ঃ-

- নীচু ছাদ এবং দেয়াল ১০ ইঞ্চি এর পরিবর্তে ৫ ইঞ্চি হওয়ায় প্রচন্ড গরম অনুভূত হয় ।
- জানালা ছোট, দরজা কম এবং কক্ষের সংখ্যা কম ।
- রুমের আয়তন ছোট এবং ড্রইং-ডাইনিংএক সাথে ।
- মোজাইক ও ফিনিশিং নিম্নমানের ।
- টয়লেট ছোট, সারভেন্ট টয়লেট নেই ।
- পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস এবং সুয়্যারেজ লাইন অপরিকল্পিত ও নিম্নমানের এবং পানির আলাদা মিটার নেই ।
- সিঁড়ি ও লিফ্‌ট স্বল্পপরিসরের । আবার কোথাও কোথাও লিফট্‌ও নেই । আলো বাতাসের অপর্যাপ্ততা ।
- জরুরী অবতরণের জন্য বিকল্প সিড়ি নেই। খোলা সিড়িঘর হতে সরাসরি ফ্লাটের দরজা । ফলে কোথাও আগুন লাগলে তা দ্রুত ছড়িয়ে পড়বে । বারান্দর সংখ্যা কম ও স্বল্প পরিসরের । শিশুদের খেলা ধূলার জায়গা নেই । অবর্জনা ফেলার সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা নেই ।
- নির্মাণগত ত্রুটির কারণে অনেক অ্যাপার্টমেন্টের দেয়ালে ফাটল ধরেছে।

৮.২ অ্যাপার্টমেন্ট দ্বারা সৃষ্ট বাহ্যিক পারিবেশিক সমস্যা

- ঢাকা শহরে সুউচ্চ অ্যাপার্টমেন্ট নির্মাণে কোন জোনিং কন্ট্রোল না থাকায় তা শহরের সর্বত্র বিক্ষিপ্ত ভাবে গড়ে উঠেছে। রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের ইমারত নির্মাণ বিধিমালা ১৯৮৪ অনুযায়ী ইমারতের আচ্ছাদিত অংশের আয়তন হবে তার সাইটের দুই তৃতীয়াংশ এবং সাইটের আয়তন ৫ কাঠার অধিক হলে ইমারতের পাশ্চাৎদিকে ৪ মিটার এবং দুই পাশে ১.২৫ মিটার করে জায়গা ছাড়তে হবে। এছাড়া সুউচ্চ ইমারত নির্মাণের ক্ষেত্রে ৬ তলার উর্দ্ধে ইমারতের উচ্চতা বৃদ্ধির সাথে সাথে এর আয়তন হ্রাস পাবে। অর্থাৎ ইমারতের সামনের দিকে জায়গা ছেড়ে দিতে হবে। কিন্তু বর্তমানে যে সকল সুউচ্চ অ্যাপার্টমেন্ট নির্মিত হচ্ছে তাতে রাজউক এর ইমারত নির্মাণ বিধিমালা সুস্পষ্ট ভাবে লঙ্ঘিত হচ্ছে। এই বিধিমালা লঙ্ঘন করে অ্যাপার্টমেন্টসমূহ সম্পূর্ণ সাইটের উপর উলম্বভাবে গড়ে উঠায় এগুলো পাশ্ববর্তী সংকীর্ণ রাস্তার সাথে গিরিখাত জনিত পরিবেশ সৃষ্টি করছে। এর ফলে বায়ুপ্রবাহ এবং বায়ু দূষক সমূহ বাধাপ্রাপ্ত হয়ে পরিবেশকে দূষিত করছে।
- সুউচ্চ অ্যাপার্টমেন্টের পাশে অবস্থিত স্বল্প দৈর্ঘ্যের ইমারতসমূহে স্থায়ী ভাবে আলো-বাতাস চলাচল বিঘ্নিত হওয়ায়, এর বাসিন্দাগণ স্নায়ুরোগ, ভাইরাস জনিত বিভিন্ন রোগ ও হৃদরোগে আক্রান্ত হতে পারে এবং সে সাথে স্বল্পদৈর্ঘ্যের ইমারত বাসিন্দাদের প্রাইভেসীও নষ্ট হচ্ছে।
- ঢাকা শহরে নির্মিত সুউচ্চ অ্যাপার্টমেন্টগুলোতে সাধারণতঃ অধিক আয়ের লোকজন বাস করে। গ্রীষ্মকালে অস্বস্তিকর আবহাওয়া হতে মুক্তি পাওয়ার জন্য তাদের অনেকেই শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র ব্যবহার করে থাকে। এই শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের মাধ্যমে অ্যাপার্টমেন্ট কক্ষের আর্দ্র ও উষ্ণ বায়ু বাইরে বের হয়ে যাবার ফলে তা পার্শ্ববর্তী এলাকার আর্দ্রতার স্তরকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করে। এর ফলে অ্যাপার্টমেন্টের পার্শ্ববর্তী এলাকার লোকজনকে গ্রীষ্মকালে খুবই অসহনীয় পরিবেশে বাস করতে হয়।

৯.০ উপসংহার

রাজধানী নগরী হিসাবে ঢাকা বর্তমানে সুরম্য অট্টালিকা, মার্কেট তথা প্লাজা ও কমিউনিটি সেন্টারে ভরপুর হলেও এর বিশাল আঙ্গিনা আজ নানা দুর্ভোগের শিকার। পৃথিবীর সকল দেশেই রাজধানী শহরকে একটি শো-পিস হিসাবে তুলে ধরা হয়। সুন্দর সুন্দর রাস্তাঘাট, সুন্দর যোগোযোগ ব্যবস্থা, সুন্দর দোকানপাট এগুলো যে কোন রাজধানী শহরের অলঙ্কার । কিন্তু ১ (এক) কোটি লোকের বাস বর্তমানে মেগাসিটি ঢাকার দিকে তাকালে আমরা দেখি সম্পূর্ণ বিপরীত এক চিত্র । অথচ রাজধানীর বেশির ভাগ মানুষেরই রয়েছে সুন্দর পরিবেশের প্রতি প্রচন্ড আগ্রহ। উদাহরণস্বরূপ ২০০২ সালের নভেম্বর মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত বৃক্ষমেলার কথাই ধরা যাক, এই বৃক্ষমেলায় রেকর্ড পরিমাণ চারাবৃক্ষ বিক্রি হয়েছে । এই বিক্রির পরিমাণ ছিল ১ কোটি টাকার ওপরে । রাজধানীর মানুষ যে ক্রমশ বৃক্ষপ্রেমিক হয়ে উঠছে এটি তারই এক জ্বলন্ত প্রমাণ। কিন্তু বর্তমানে ঢাকা নগরীর সড়ক চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে । মেগা দূষণ নিয়ে ক্রমাগত মেগাসিটিতে পরিণত হচ্ছে আমাদের ঢাকা। অপরিকল্পিত নগরায়ন ও উন্নয়ন কর্মকান্ডের ঢাকা কেন্দ্রিকতা ইতিমধ্যেই ঢাকাকে অধিক জনসংখ্যার ভারে আক্রান্ত করে তুলেছে । বায়ু, পানি ও শব্দ দূষণ ছাড়াও ঢাকার বাণিজ্যিক ও গৃহস্থালীর ডাম্পিংও ঢাকার পরিবেশ দূষণের অন্যতম কারণ । আবাসিক এলাকায় শিল্পকারখানার অনুমোদন এ দূষণের মাত্রাকে কেবল বাড়িয়ে চলেছে । অন্যদিকে শিল্পকারখানায় পরিবেশ উপযোগী ব্যবস্থা না থাকার ফলে শিল্প বর্জ্যও আমাদের জীবনকে দূবিষহ করে তুলেছে। উন্নত বিশ্বে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী মালিকানার প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের মোট বিনিয়োগের ৪-৫ শতাংশ পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য ব্যয় করতে বাধ্য । জাতীয় আয়ের ২.২ শতাংশ তারা ব্যয় করে পরিবেশের উন্নয়নে । আমাদের দেশে এরকম কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। নিজেদের অস্তিত্বের প্রয়োজন আজ এই ধরনের বাধ্যবাধকতা নিতান্তই জরুরী হয়ে পড়েছে । ঢাকা শহরের বায়ু দূষণের অন্যতম কারণ ডিজেল চালিত স্কুটার। সরকার এই স্কুটারের ব্যবহার সীমিত করে যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিয়েছে । যথাযথ নগরায়নের জন্য উপযুক্ত রাস্তাঘাট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান, চিত্ত বিনোদন ব্যবস্থা, সহজলভ্য জ্বালানী, যথাযথ হাটবাজার প্রভৃতি সঠিকভাবে সরবরাহ ও ব্যবস্থাদির অবকাঠামো দূষণমুক্ত পরিবেশ ইত্যাদি গড়ে তোলা সহজ নয় কোনো অর্থেই । কিন্তু তা একেবারে অসম্ভবও নয়। সীমিত সামর্থ্য সত্ত্বেও ঢাকার দূষণের মাত্রা গ্রহণযোগ্য মাত্রায় নামিয়ে আনা সম্ভব। এর জন্য দরকার সদিচ্ছা, যথার্থ উদ্যেগ, সুষ্ঠু মনিটরিং এবং সর্বোপরি নিজেদের দায়িত্ব পালনে ঢাকাবাসীর আন্তরিকতা । আদর্শ নগরায়নের জন্য এখন থেকে রাজউক, ডিসিসি ও সর্বোপরি সরকার পরিকল্পনা না নিলে রাজধানীতে আধুনিক নগরায়ন সম্ভব হবে না। পরিবেশ সংরক্ষণ ও দূষণ রোধে ১৯৭৩ সালে পানি দূষণ অধ্যাদেশ, ১৯৯২ সালে

পরিবেশ নীতি ও ১৯৯৫ সালে পরিবেশ সংরক্ষণ আইন জারি করা হয়। সর্বশেষ ১৯৯৭ সালের ২৮ আগষ্ট জারি করা হয় পরিবেশ অবক্ষয় ও দূষণ রোধে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা। এই সব নীতিমালা সকলেই মেনে চলতে হবে। তবে তার সাথে ঢাকার পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে গণসচেতনতা ও সামাজিক দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি করতে হবে তবেই ঢাকা শহরের পরিবেশ দূষণ রোধ করা সম্ভব।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

- দৈনিক প্রথম আলো, ২৯শে আগষ্ট ২০০২ ।
- দৈনিক ইত্তেফাক, ১লা ফেব্রুআরী ২০০১ ।
- দৈনিক ইত্তেফাক, ৪ঠা জানুয়ারী ২০০৩ ।
- দৈনিক যুগান্তর, ১৫ই সেপ্টেম্বর ২০০২ ।
- বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা, ষষ্ঠ বর্ষ সংখ্যা, নভেম্বর ২০০১, হাসপাতালে বর্জ্য ব্যবস্হাপনাঃ তিনটি হাসপাতালের উপর একটি সমীক্ষা। সৈয়দা পাপিয়া নাহিদ পপি, মহামায়া আচার্য্য ।
- হোসেন, ম. ১৯৯৯, প্রবাহ ঢাকা, কালারটেক, মগবাজার ।
- Ahmed A. U. & Reazuddin 2002: Industrial Pollution of Water System in Bangladesh. In: Rahman A. A., Huq S. & Conway G.R.(ed.): Environmnetal System of Surface Water System of Bangladesh, UPL, Dhaka. pp.175-178.
- BBS 1998: Statistiacl Year Book of Bangladesh, Bangladesh Bureau of Statistics, Ministry of Palnning, Dhaka.
- Islam, N 1996 "Dhaka: From city to Meyacity", Dhaka, Urban studies programme, Department of Geography, University of Dhaka.
- Kamal A.K.M.M. 1997. A study on disposal of Hospital Nipsom Library Dhaka.

  Planning Commission, 1991. "Task Force on Social Implications of Urbanization in Bangladesh", Dhaka : Government of Bangladesh.
- Solid Waste Disposal in District Health Facilities: 1994, World Health form.
- UNEP 2001: State of the Environment – Bangladesh, UNEPRRC, AP Thailand.

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা,
সপ্তম বর্ষ সংখ্যা কার্তিক ১৪০৯

যুক্তরাষ্ট্রের কতিপয় স্থাপনায় সন্ত্রাসী হামলা ও বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এর প্রভাব: একটি বিশ্লেষণ

প্রদীপ কুমার পাণ্ডে*

Terrorist Attack on some American Installations and its impact on Bangladesh Economy: An Analysis

Pradip Kumar Pandey

Abstract: Terrorist attacks on Twin Tower at Chicago in USA on September 11, 2001 have far reaching impact on the global economy. It is difficult to assess the negative impact of this incident on the economy that had happened only six months ago. But one thing is clear that it is not be confined to US only, its impact rather progressively cast shadow over the economy of both the poor and the rich countries. The USA (United States of America) is the main development partner and the single largest export market of Bangladesh absorbing about 39 percent of our total exports. US helps Bangladesh whenever the latter seeks help on acceptable reasons. The negative impact of the incident of the 11th has already been prevalent in Bangladesh economy. This paper attempts to critically examine the impacts of the terrorist attacks on Bangladesh economy and suggests recommendations in order to overcome the problem.

১. ভূমিকা

১১ সেপ্টেম্বর ২০০১-এ আমেরিকার টু-ইন টাওয়ার, ওয়াশিংটনের পেন্টাগন এবং পেনসিলভানিয়ায় মারাত্মক বিমান হামলার ফলে হতাহত হয়েছে আমেরিকায় কর্মরত বিভিন্ন দেশের হাজার হাজার নিরীহ মানুষ। বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্রে এ ধরনের নাটকীয় হামলায় বিশ্ববাসী বিস্মিত, মর্মাহত এবং স্তম্ভিত। এই হামলায় শুধু আক্রান্ত হয়নি আমেরিকা, পরোক্ষভাবে তার বিরূপ প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে গোটা বিশ্ব-অর্থনীতি। কারণ সমগ্র বিশ্ব অর্থনীতির মোট জিডিপির প্রায় এক-তৃতীয়াংশই আসে আমেরিকার অর্থনীতি থেকে। হামলার ফলে মার্কিন শেয়ার বাজারে ধ্বস নামে এবং মার্কিন অর্থনীতি সবচেয়ে বড় বিপর্যয়ের মুখে পড়ে। হামলা পরবর্তী মার্কিন অর্থনীতি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে শিকাগোভিত্তিক একটি আন্তর্জাতিক বিপণন সংস্থা Andrew-Ward Inc. এর প্রধান জন এ ক্যাসলিওন (John A. Caslione) বলেন, “The US economy may actually be destined for a much deeper decline before it begins to emerge into more positive territory”।[১]

---

* সহকারী অধ্যাপক, গণযোগাযোগ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

মার্কিন অর্থনীতির মন্দাভাব বাংলাদেশের অর্থনীতিতেও ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলেছে। কারণ আমেরিকা বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় উন্নয়ন সহযোগী দেশগুলোর অন্যতম এবং বাংলাদেশের রপ্তানীজাত পণ্যের প্রায় ৩৯ শতাংশ যায় আমেরিকায়। কিন্তু হামলার ফলে এই রপ্তানীতে ধ্বস নামে। ক্ষতিগ্রস্থ হয় বাংলাদেশের অর্থনীতি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সন্ত্রাসী হামলা বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কি প্রভাব ফেলেছে- আলোচ্য প্রবন্ধে সে বিষয়টিকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

২. সন্ত্রাসী হামলার প্রভাব- যুক্তরাষ্ট্রে অর্থনৈতিক বিপর্যয়

১৫ সেপ্টেম্বর ২০০১ তারিখে The Economist পত্রিকার প্রচ্ছদ শিরোনাম ছিলো 'The Day the world changed'। এই একটি শিরোনামেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে টুইনটাওয়ার ও পেন্টাগনে সন্ত্রাসী হামলার মুহূর্তে সারাবিশ্বের অর্থনৈতিক গতিধারা, প্রভাবক ও চলকসমূহের সক্রিয়তা, প্রকৃতি মন্দা হতে মন্দাতর অবস্থায় পৌছেছে। ১১ সেপ্টেম্বরের সন্ত্রাসী হামলার ফলে এর সৃষ্টি না হলেও ঐ হামলা যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক মন্দাকে ত্বরান্বিত করেছে। অনেক অর্থনীতিবিদ মনে করছেন, ২০০১ সালের মার্চ মাস থেকেই মার্কিন অর্থনীতিতে মন্দার সূচনা হয়েছিল। বছরের তৃতীয় ভাগে (জুলাই-সেপ্টেম্বর) এসে তা পুরোপুরি নিম্নমাত্রায় পৌছে। বিশ্বব্যাপী প্রবৃদ্ধির হার পৌছে ১ শতাংশে। অর্থনীতিবিদদের দৃষ্টিতে বিশ্ব অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ২.৫ এর নিচে এলে মহামন্দা বলা হয়। মার্কিন অর্থনীতির সমস্যা ছিল অতি বিনিয়োগ। পুঁজিবাজার চাঙ্গা থাকায় বিনিয়োগ আরও সম্প্রসারিত হয়েছিল। এতে কোম্পানীগুলো শেয়ার মূল্যকে জামানত হিসেবে ব্যবহার করতে পেরেছিলো। ডাউ ক্যামিক্যালস্ এর চেয়্যারম্যান ইউলিয়াম ম্যাড্রোপুলাস বলেছেন, আমাদের মূলধন বিনিয়োগ আসলে ফুঁলেফেঁপে উঠেছিল অবিশ্বাস্যভাবে। গত বছরের মাঝামাঝি সময় থেকে সেই বিনিয়োগ নেমে যায়। এ সময় বাজারের প্রতি ক্রেতাদের আস্থা কমে যায় মারাত্মকভাবে। ১১ সেপ্টেম্বরের হামলা এতে নতুন মাত্রা যোগ করে। বড় বড় কোম্পানীগুলো বিশেষ করে ইলেকট্রনিক ও টেলিকম সেক্টরের অতিকায় প্রতিষ্ঠান নিউসেন্ট, মটরোলা, হিউলেট প্যাকার্ড এবং এটিএন্ডটি শ্রমিক ছাঁটাই শুরু করলে ক্রেতাদের ক্রয় ক্ষমতায় দুর্বলতর প্রবণতা স্পষ্ট হয়ে উঠে। মার্কিন অর্থনীতির জগতে বেকার সমস্যার দৃশ্যপট নতুন রূপ নেয়। যুক্তরাষ্ট্রের ইকোনমিক পলিসি ইনষ্টিটিউটের একজন অর্থনীতিবিদ জায়ার্ড বার্ণসিন মন্তব্য করেছেন যে, এক দশকের মধ্যে এই প্রথম মার্কিন অর্থজগতে নিয়োগকর্তারা অন্য পন্থায় না গিয়ে শ্রমিক তাড়ানোর পন্থা বেছে নিয়েছে।[২] এই তাড়ানো শ্রমিকদের মধ্যে বাংলাদেশীরাও রয়েছে।

আমরা এমন এক ক্রান্তিকালে পতিত হয়েছি যেখানে বিশ্বায়িত অর্থনীতিতে উন্নতদেশের আংশিক ধ্বস তৃতীয় বিশ্বের অর্থনীতিকে একেবারে মুমূর্ষু করে ফেলে। ২০০০ সাল হতেই জাপান ও যুক্তরাষ্ট্রে যে অর্থনৈতিক মন্দা চলছিলো, ১১ সেপ্টেম্বরের আকস্মিক সন্ত্রাসী হামলায় তা এক দীর্ঘমেয়াদী মন্দায় পরিণত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকের প্রধান গ্রীন স্প্যান পর্যন্ত দ্বিধাহীন স্বীকারোক্তি দিয়েছেন যে, এই হামলার অর্থনৈতিক প্রভাব এতই গভীর যে বিশ্বায়নের কেন্দ্রভূমি যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষেও এই ধাক্কা সামলে ওঠা দীর্ঘ সময়ের কঠিন এবং কষ্টকর ব্যাপার।[৩] বিশ্বের সামগ্রিক GDP এর এক তৃতীয়াংশ আসে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি হতে।[৪] স্বাভাবিকভাবেই যুক্তরাষ্ট্রের উপর বাণিজ্যিকভাবে নির্ভরশীল রাষ্ট্রের অর্থনীতি সন্ত্রাসী হামলার প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। UN এর সমীক্ষা বলছে, চলতি বর্ষে বিশ্ব ৩৫০০০ কোটি ডলার হ্রাসের সম্মুখিন হবে। IMF আশংকা করছে বিশ্ব অর্থনীতির গড় প্রবৃদ্ধির হার ২.৪৩ থেকে ১.৪৩- এ নেমে দাঁড়াবে।[৫]

ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে হামলার পর ডলারের মূল্যের পতন ঘটে। ২০০০ সালের জানুয়ারী মাসের পর এবারই প্রথম ডলারের মান সুইস ফ্রাঙ্কের বিপরীতে সবচেয়ে নিচে নেমে আসে। তাৎক্ষণিকভাবে ইয়েন ও ইউরোর বিপরীতেও ডলারের মান দুর্বল হয়ে পড়েছিলো। হামলার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া সবচেয়ে বেশী দৃশ্যমান হয়ে ওঠে মার্কিন স্টক এক্সচেঞ্জের পতনের মাধ্যমে।

দু'দিন বিশ্বের বৃহত্তম শেয়ার বাজার আমেরিকার 'ওয়াল ষ্ট্রিটের' কাজকর্ম বন্ধ থাকার পর লেনদেন শুরু হবার আগে মার্কিন কেন্দ্রীয় ব্যাংক সুদের হার দশমিক ৫ ভাগ কমিয়ে দেয়। এর ১ ঘণ্টা পর ব্যাংক অব কানাডা একই হারে সুদ কমানোর ঘোষণা দেয়। ওয়াল ষ্ট্রিটের শেয়ার পতনের প্রভাব এশিয়ার বাজারগুলোতে বেশ প্রভাব বিস্তার করে। সেপ্টেম্বরের ২০ তারিখেও ডোজোনস ইনডেক্সের শেয়ার মার্কিন অর্থনীতির ইতিহাসে সর্বনিম্ন ৭.১২ তে নেমে আসে। নিউইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জ এর ৫৩৪ টি

স্টক ও NASDAQ এর ৭১৮ টি স্টকের মূল্য গত ৫২ বছরের ইতিহাসে সবচেয়ে নিচে নেমে আসে। হামলার ফলে

সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় আমেরিকার বিমান পরিবহন বাণিজ্য। (টেবিল-১)

টেবিল-১ঃ মার্কিন বিমান পরিবহন কোম্পানীর শেয়ারের পতন ও লোক ছাঁটাই

এয়ার লাইন	শেয়ারের পতন	লোক ছাঁটাই এর পরিমাণ
আমেরিকান এয়ারলাইনস	৩৯%	৩০ হাজার
ইউ এস এয়ার ওয়েজ	৫২৩	২০ হাজার
কন্টিনেন্টাল এয়ার লাইনস	৪৯.৪৩	২৩ হাজার

(সূত্রঃ DCCI Seminar Key-note, Page-৫ ও দৈনিক জনকণ্ঠ, ২২ সেপ্টেম্বর, ২০০১)

নিউজউইক এর তথ্যানুসারে ১১ সেপ্টেম্বর টুইনটাওয়ার ও তার পার্শ্ববর্তী ভবনে ধ্বস, পেন্টাগণের আংশিক ধ্বংস্ ও বোয়িং এর চারটি বিমান ধ্বংস- সবমিলিয়ে তাৎক্ষণিক কেবল অবকাঠামোগত ক্ষতির পরিমাণ ৩০ বিলিয়ন ডলার এবং এই ক্ষতি আগামী দুই বছরে ১০৫ বিলিয়ন ডলারে গিয়ে দাঁড়াবে।[৬]

৩. ইউরোপ ও এশিয়ার অর্থনীতি ঃ কতটা বিপর্যস্ত হয়েছে?

জার্মানীর ড্রেজডেনার ব্যাংক এজি এক বছরের মধ্যে সাড়ে বারো হাজার শ্রমিক ছাঁটাই এর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। জাপানের কম্পিউটার জায়ান্ট NEC চার হাজার শ্রমিক ছাঁটাই করবে। হিউলেট প্যাকার্ডের শেয়ার মূল্য ১.৯১ ডলার বা ৮% হ্রাস পেয়েছে। প্রিন্টার ও কম্পিউটার উৎপাদনকারী এই সংস্থাটি ছয় হাজার শ্রমিক ছাঁটাই করছে।[৭] বিশ্বের পুঁজিপতি মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানী, মার্কিন অর্থনীতির সাথে যাদের মুনাফার প্রবৃদ্ধি সরাসরি জড়িত, প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার স্বার্থে ও মন্দাশীল বাণিজ্যের আকস্মিক ধাক্কায় শ্রমিক-নির্বাহী-খরচ অলাভজনক হয়ে পড়ায় চলছে শ্রমিক ছাটাই করা ও দুটি প্রতিষ্ঠান মিলে একীভূত হওয়ার প্রবণতা। মন্ট্রিলভিত্তিক এয়ার-কানাডা অর্থবছরের শেষে লোকসান দেয় ৭০.৫৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।[৮] তবে এই মন্দা যে পুরোপুরি সন্ত্রাসী হামলা পরবর্তী প্রভাব প্রসূত-তা নয়। দি ইকোনোমিস্ট হিসাব দিয়েছে, ২০০০ সালের প্রথম ভাগ থেকেই এ পর্যন্ত গড়ে ২৮% হারে শেয়ারের দাম কমে যাওয়ায় বিশ্ব অর্থনীতি থেকে ১০ লাখ কোটি (১০ ট্রিলিয়ন) ডলার খোয়া গেছে। এছাড়াও সন্ত্রাসী হামলার ফলে বিশ্ব অর্থনীতিতে তাৎক্ষণিক যেসব পরিবর্তন ঘটেছে, সেগুলো হলো-

১) বিশ্ববাজারে তেল ও স্বর্ণের দাম বেড়ে যায়।
২) ইউরোপ ও এশিয়ায় বিভিন্ন শেয়ারের বাজারে সূচকের পতন ঘটে।
৩) ইয়েন ও ইউরোর বিপরীতে ডলারের দাম কমে। .
৪) পরিস্থিতি সামাল দেবার জন্য ওপেক বিশ্ববাজারে পর্যাপ্ত তেল সরবরাহের আশ্বাস দিলে ইউরোপের বাজারে আবার তেলের দাম কমে।

৫) মন্দা অর্থনীতি সামাল দেবার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংক অতিরিক্ত অর্থ সরবরাহের প্রস্তুতি নেয়।

৬) বীমার টাকা পরিশোধের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বীমা কোম্পানী ও বীমা পুন:বীমাকারী সংস্থাকে কোটি কোটি ডলার প্রদান করতে হয়।

৭) বিশ্ব বাণিজ্যের রপ্তানী ক্ষেত্রে দারুণ বিপর্যয় নেমে আসে। যেমন, বাংলাদেশের গার্মেন্টস।

অর্থাৎ একথা পরিস্কার যে, বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার বর্তমান অবস্থার জন্য সন্ত্রাসী হামলার ঘটনাটি মূল কারণ নয় বরং অত্যন্ত শক্তিশালী এবং ইতিহাসের সর্ববৃহৎ প্রভাবক হিসাবে ধরা যায়।

৪. বাংলাদেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সম্পর্ক

প্রশ্ন উঠতেই পারে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সন্ত্রাসী হামলা হয়েছে, তাতে বাংলাদেশের অর্থনীতির কি এমন যায় আসে। প্রকৃতপক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের প্রধানতম উন্নয়ন অংশীদার। বাংলাদেশে যে বিদেশী বিনিয়োগ আসে, তার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের অংশীদারিত্ব উল্লেখযোগ্য। এ পর্যন্ত মোট ৮৯টি মার্কিন প্রকল্প প্রস্তাব বিনিয়োগ বোর্ডে নিবন্ধিত হয়েছে। এতে প্রস্তাবিত বিনিয়োগের পরিমাণ ৪শ ৫০কোটি ৩০লক্ষ ডলার। ১৯৯৫-১৯৯৬ হতে ২০০০-২০০১ অর্থবছর পর্যন্ত সময়ে বাংলাদেশ মোট ৩হাজার ৯৯কোটি ৪৩লক্ষ ডলার মূল্যের পণ্য রপ্তানী করে। এর মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানী করা হয় ১হাজার ১শ ৭৫কোটি ২১লক্ষ সমতুল্য ৫৫হাজার ৮শ ৪৫কোটি ৯৮লক্ষ টাকার পণ্য। অর্থাৎ বর্ণিত ৬ বছরে বাংলাদেশ যে পণ্য রপ্তানী করে তার ৩৬.২৪ শতাংশ যায় যুক্তরাষ্ট্রে। ২০০০-২০০১ অর্থবছরে বাংলাদেশ থেকে রপ্তানী করা পণ্যের ৩৮.৬৭ শতাংশ যায় যুক্তরাষ্ট্রে। আলোচ্য ৬ বছরে বাংলাদেশে তৈরী পোষাকের ৫১ শতাংশ রপ্তানী করা হয় যুক্তরাষ্ট্রে ।[৯] আর তাই এ নির্ভরতা।

৫. বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রভাব ঃ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ

১১ সেপ্টেম্বর সন্ত্রাসী হামলার পর সমগ্র বিশ্বব্যাপী মন্দাভাব, অনিশ্চয়তা, অস্থিতিশীলতা ও যুদ্ধজনিত পরিবেশ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অনিবার্য প্রতিকূল প্রভাব ফেলেছে। সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্তৃপক্ষের রিপোর্ট মতে চলতি অর্থবছর শেষে লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ৭৮ কোটি মার্কিন ডলার রপ্তানী আয় কম হবে। বিশ্ব অর্থনীতির শ্লথগতি অব্যাহত থাকলে বর্তমান অর্থবছরে (২০০১-২০০২) ওভেন পোশাক খাতে রপ্তানি আয় লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ৩৭ কোটি ডলার, নীটওয়্যার রপ্তানিতে ১৭ কোটি

ডলার, হিমায়িত খাদ্যে ১০ কোটি ডলার, পাট ও পাটজাত খাতে ৩ কোটি ডলার, চামড়া ও চামড়াজাত খাতে সাড়ে ৫ কোটি ডলার ও অন্যান্য খাতে আরো সাড়ে ৫ কোটি ডলার রপ্তানী আয় কমবে।[১০] অক্টোবর মাস হতেই কমে গেছে আমাদের বৈদেশীক মুদ্রার রিজার্ভ। একদিকে রপ্তানী কমেছে অন্যদিকে আমদানী বাড়ার কারণে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কমছে। বস্তুত যেকোনো দেশের অর্থব্যবস্থার স্বাভাবিক নিয়মানুযায়ী রপ্তানীর তুলনায় আমদানী বাড়লে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে চাপ পড়ে। বাংলাদেশের বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে আমদানি, রপ্তানী ও রাজস্ব এই ৩টি সূচকের বিশ্লেষণ সুস্থ অর্থনীতির পরিচায়ক নয়। আমদানি ব্যয় মেটানোসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রীয় খরচার কারণে বর্তমানে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বেশ কমেছে। বর্তমানে এই রিজার্ভ ১০৮৫.৩৫ মিলিয়ন ডলার যা দিয়ে মাত্র ৪২ দিন জাতীয় আমদানির প্রয়োজন মেটানো সম্ভব।[১১]

এ পরিস্থিতিতে আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংকের পরামর্শ অনুসরণে রাজস্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন পণ্যের ওপর নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক আরোপ করেছে। ইতোমধ্যে তেল, গ্যাস ও বিদ্যুতের দাম বাড়ানো হয়েছে। অন্যান্য পরিসেবার দামও বাড়ানো হবে পর্যায়ক্রমে। ওয়াসা বলেছে, বিদ্যুতের দাম বাড়লে পানির দামও বাড়বে। জ্বালানী তেলের দাম বেড়েছে। ফলে পরিবহন খরচও বেড়ে গেছে। এই বর্ধিত ব্যয়ের বোঝা টানতে হচ্ছে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়কেই। গ্যাস ও বিদ্যুতের মূল্য-বৃদ্ধির সাথে সাথে পণ্যের উৎপাদন ব্যয়ও বৃদ্ধি পাচ্ছে। রপ্তানী পণ্যের উৎপাদন ব্যয়-বৃদ্ধি পাওয়ায় রপ্তানী বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এককথায় আভ্যন্তরীণ বাজারে উৎপাদনশীল সবরকম উদ্যোগের ওপর জ্বালানীর মূল্য-বৃদ্ধির নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। ফার্নেস অয়েলের দাম এক লাফে দ্বিগুণ হওয়ায় খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলের মত অনেক কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম। বলাই বাহুল্য এতোসব দুর্ভোগ যুক্তরাষ্ট্রে সন্ত্রাসী হামলা ও আফগান যুদ্ধের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ফল।[১২]

আমেরিকার অর্থনীতিতে বিপর্যয়, USTDA ২০০০ (United States Trade Development Act) আইনের কারণে সাব সাহারান আফ্রিকান ও ক্যারিবিয়ান ৭২ টি দেশের রপ্তানী পণ্য আমেরিকায় ডিউটি ফ্রী, কোটা ফ্রী প্রবেশাধিকার, আফগানিস্তানের যুদ্ধের ফলে আমেরিকা সহ অন্যান্য দেশের ভোগ্য পণ্যে ব্যয় হ্রাস, মন্দা, বেকারত্ব, ইত্যাদি কারণ মিলিয়ে আন্তর্জাতিক বাজারের তুলনায় বাংলাদেশের অর্থনীতি ব্যাপক সমস্যার সম্মুখীন। আর তাই এই নিবন্ধে, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ও যুক্তরাষ্ট্রে সন্ত্রাসী হামলার ফলে অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও ঘটে যাওয়া অর্থনৈতিক ক্রান্তি দশার স্বরূপ বিশ্লেষণের প্রচেষ্টাই মুখ্য।

টেবিল-২ঃ এক নজরে টুইন টাওয়ারে সন্ত্রাসী হামলার ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রভাব

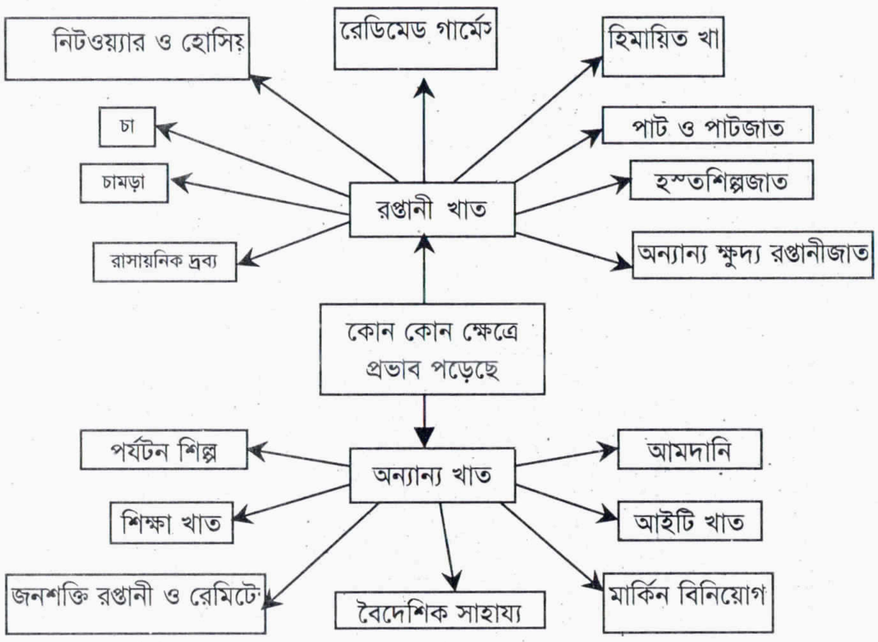

৬.১ সর্বাধিক আক্রান্ত খাতঃ বাংলাদেশের রপ্তানী শিল্প

বাংলাদেশের রপ্তানী শিল্প মার্কিন বাণিজ্যের উপর অত্যন্ত সক্রিয় এবং সংবেদনশীল ভাবে নির্ভর করে (টেবিল-৩)।

টেবিল-৩ ঃ বাংলাদেশের রপ্তানীর প্রধান গন্তব্য

অর্থ-বছর	আমেরিকার রপ্তানী	ইউরোপীয় ইউনিয়ন	কানাডা ও অন্যান্য রাষ্ট্র
১৯৯৭-৯৮	৪৪.২১%	৫১.১৬%	৪.৬৪%
১৯৯৮-৯৯	৪৪.৭৬%	৫০.৯৫%	৪.২৯%
১৯৯৯-০০	৪৫.৮০%	৪৯.৬৮%	৪.৫২%

(সূত্রঃ DCCI Seminar Key-note, Page-২)

টেবিল:৩ হতে দেখা যায়, বাংলাদেশের রপ্তানী পণ্য ক্রয়ে যুক্তরাষ্ট্র প্রতিবছর শীর্ষে অবস্থান করে। তাই যুক্তরাষ্ট্রের সন্ত্রাসী হামলার প্রভাবের সর্বাপেক্ষা প্রকট শিকার- বাংলাদেশের রপ্তানী শিল্প।এক্সপোর্ট প্রমোশন ব্যুরোর পরিসংখ্যানে (টেবিল-৪) দেখা যায় যে, চলতি অর্থবছরের প্রথম চার মাসে প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা এর আগের বছরের তুলনায় বেশ নেতিবাচক।

টেবিল- ৪ঃ জুলাই-অক্টোবর ২০০১-২০০২ অর্থবছরে বাংলাদেশের প্রাথমিক পণ্য ও শিল্পজাত পণ্যের রপ্তানী চিত্র

রপ্তানী খাত	প্রকৃত রপ্তানী জুলাই-অক্টো ২০০০-২০০১ (মিলিয়ন ডলার)	জুলাই-অক্টো ০০-০১ এর তুলনায় জুলাই অক্টো ০১-০২ সময়ের শতকরা হ্রাস-বৃদ্ধি	লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় জুলাই-অক্টো ২০০১-২০০২ সময়ের শতকরা হ্রাস বৃদ্ধি
কাঁচাপাট	২০.৯৬	(-) ২৩.৭১	(-) ৩১.৪৬
চা	১০.৫১	(-) ৩২.৬৪	(-) ২৯.২০
চামড়া	৭৬.৮৯	(-) ৩.৫১	(-) ২২.৭২
হিমায়িত খাদ্য	১৬৮.০৫	(-) ৩২.৮৪	(-) ১০.১৮
পাটজাত দ্রব্য	৮৬.৮৩	(-) ১৩.৩৫	(-) ১৭.৯২
হস্ত শিল্পজাত দ্রব্য	২.২৫	(+) ১৯.২২	(-) ২২.৮৫
তৈরী পোষাক	১১৫৬.৬৮	(-) ৯.৪৭	(-) ১৫.১০
নিটওয়্যার সামগ্রী	৪৯৬.৬২	(-) ৩.৩০	(-) ১৫.২৬
রাসায়নিক দ্রব্য	৪১.৩৬	(-) ২৪.৪০	(-) ১৪.৭৩
অন্যান্য	১৬৮.৮১	(-) ৫.৭৯	(-) ২০.৩৫
মোট	২২২৯.২৭	(-) ১০.০৬	(-) ১৬.১১

(সূত্রঃ এক্সপোর্ট প্রমোশন ব্যুরো ও ব্যাংকার, মার্চ' ২০০২ সংখ্যা)

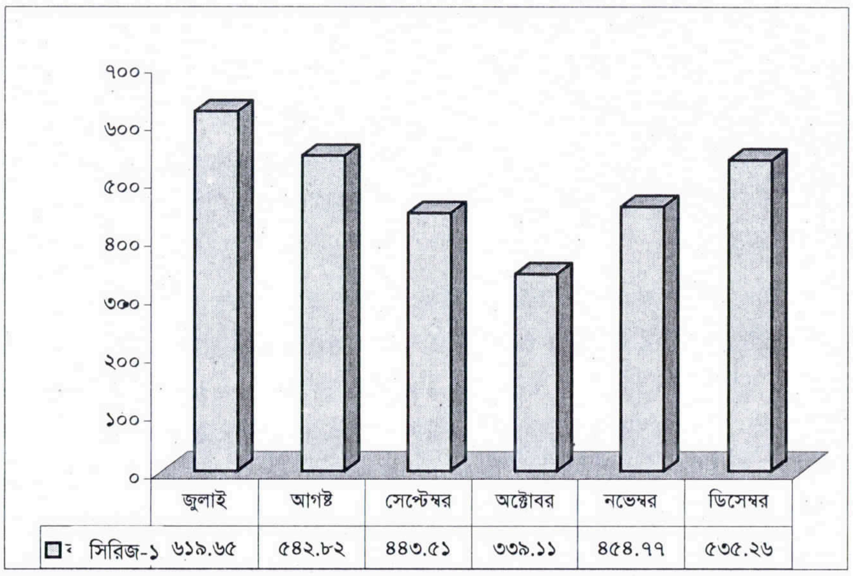

গ্রাফ-১: যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের রপ্তানী মূল্যমানের হ্রাস-বৃদ্ধি (মিলিয়ন ডলারে)
সূত্র: রপ্তানী বিবরণীর প্রতি মাসিক ফাইল, বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র, ইপিবি, স্ব-সংগৃহিত, ঢাকা।

এক্সপোর্ট প্রমোশন ব্যুরোর সূত্রানুসারে জুলাই'০১ এর রপ্তানী মূল্য ৬১৯.৬৫ মিঃ ডলার ও অক্টোবরের রপ্তানী মূল্য ৩৩৯.১১ মিঃ ডলার এর মধ্যে ২৮০.৫ মিলিয়ন ডলারের ব্যবধান দেখেই বোঝা যায় বাংলাদেশের রপ্তানী শিল্প যুক্তরাষ্ট্রে সন্ত্রাসী হামলার প্রভাবে কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এবারে, রপ্তানী পণ্যের প্রধান খাতগুলো গুরুত্বের ক্রমানুসারে অর্থনৈতিক বিশ্লেষণসহ তুলে ধরা হলো-

৬.১-ক তৈরী পোষাক শিল্প

ওভেন গার্মেন্টস ও নীটওয়্যার অর্থাৎ তৈরী পোষাক শিল্প হলো বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানী খাত। এই রপ্তানীর প্রায় চল্লিশ ভাগ এর ক্রেতা আমেরিকা।[১৩] EDP সূত্রানুসারে গত ২০০০-২০০১ অর্থ বছরে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের মোট রপ্তানীর ৮৭.৯২% রপ্তানী করে আয় হয়েছে ২১৯৮.৪৩ মিলিয়ন ডলার।[১৪] গত ২০০০ সালে USTAD-২০০০ বিলের মাধ্যমে সাব সাহারান আফ্রিকান ও ক্যারিরিয়ান ৭২টি দেশ যুক্তরাষ্ট্রে কোটামুক্ত ও শুল্কমুক্ত পোষাক রপ্তানীর প্রবেশাধিকার পায়। ফলে বাংলাদেশের তৈরী পোষাকের চাহিদা যুক্তরাষ্ট্রে কমে গিয়েছে। ২০০১ সালের নভেম্বরে তৎকালিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও BGMEA এর সভাপতির নেতৃত্বে উচ্চতর ক্ষমতাসম্পন্ন টিম আমেরিকাতে বাংলাদেশের তৈরী পোষাকের কোটামুক্ত ও শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার অর্জনের চেষ্টা চালালেও সন্ত্রাসী হামলার পরোক্ষ প্রভাবে মার্কিন কংগ্রেস যথাযথ ব্যবস্থা নেয়নি।[১৫] উপরন্তু হামলা পরবর্তী কথিত সন্ত্রাসী ওসামা বিন

লাদেনের আলকায়েদা নেটওয়ার্ক ও তালিবানদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বিনিয়োগ বেড়ে যাওয়ায় মার্কিন পোষাক তৈরীর অর্ডারের অভাবে বাংলাদেশের সাড়ে তিন হাজার গার্মেন্টস-এর মধ্যে ১২০০ এর অধিক গার্মেন্টসে উৎপাদন সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে সাড়ে চার লক্ষ গার্মেন্টস কর্মী বেকার হয়েছে এবং এই সেক্টরের ৫০০ কোটি ডলারের রপ্তানীর ৪০% ইতিমধ্যেই হ্রাস পেয়েছে।[১৬]

১৯৭৭-৭৮ অর্থবছরে প্রথম তৈরী পোষাক বিদেশে রপ্তানী করা হয়। সে সময় মাত্র ৯ টি গার্মেন্টস কারখানা থেকে জার্মানীতে বার্ষিক ৪০ হাজার শার্ট রপ্তানী করা হয়। এ সময় বার্ষিক রপ্তানী আয় ছিল মাত্র ১০ লাখ ডলার। ৮০'র দশকের শুরুতেই বাংলাদেশে তৈরী পোষাক শিল্প দ্রুত বিকাশ লাভ করতে থাকে। ১৯৮৩-১৯৮৪ অর্থবছরে পোষাক শিল্পে রপ্তানী আয় বেড়ে দাঁড়ায় ৬ কোটি ১৫ লাখ মার্কিন ডলারে। পরের বছরই এ খাতে রপ্তানী আয় বেড়ে দাঁড়ায় ৪ গুণ। ২০০০-০১ অর্থবছরে এ খাতে রপ্তানী আয় ছিল ২১৯ কোটি মার্কিন ডলার যা হামলার পর নেমে আসে ৬০-৮০ কোটি মার্কিন ডলারে যা আমাদের রপ্তানীখাতের জন্য মারাত্মক হুমকিস্বরূপ।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সন্ত্রাসী হামলার ফলে বাংলাদেশের পোষাক শিল্পের ভবিষ্যত অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়লেও ভারত ও পাকিস্তান এ থেকে বাড়তি সুবিধা আদায় করতে সক্ষম হয়েছে। টেবিল-৫ এ দেখানো হয়েছে, কিভাবে ভারত ও পাকিস্তান লাভবান হয়েছে এবং কি ভাবে বাংলাদেশের পোষাক রপ্তানী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

টেবিল-৫: বাংলাদেশের পোষাক রপ্তানী কমার চিত্র

	অক্টোবর, ২০০১	নভেম্বর,২০০১
বাংলাদেশ	-৮.৩২	-১৮.৪২
পাকিস্তান	১৮.৪৪	১৯.০৬
ভারত	৮.৯৫	২৩.২৪

সূত্র: দৈনিক প্রথম আলো, ফেব্রুয়ারী, ১১, ২০০২

গত অর্থবছরের প্রথম ৫ মাসে পোশাক রপ্তানী ছিল ১৪৩ কোটি ডলার যা এবার ১২৮ কোটি ডলারে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।[১৭] দৈনিক সংবাদের এক রিপোর্ট অনুযায়ী সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি থেকে অক্টোবর মাসের শেষ অবধি এদেশের ৩০টি পোশাক-শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষতির পরিমাণ ১০০ কোটি টাকা।[১৮] এ বিশাল ক্ষতির ফলে গার্মেন্টস প্রতিষ্টানসমূহের পক্ষে বিভিন্ন ব্যাংক থেকে নেওয়া ৫০০০ কোটি টাকা ঋণ পরিশোধ করা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

৬.১-খ হিমায়িত খাদ্য

২০০১ সালের জানুয়ারী-অক্টোবর পর্যন্ত ১০ মাসে এই খাতে রপ্তানী আয় হয়েছে ২২ কোটি ৫৯ লাখ ডলার, যেখানে গত বছর ২০০০ সালের একই সময়ে আয় হয়েছিলো ৩৪ কোটি ৩৫ লাখ ডলার।

যুক্তরাষ্ট্রে সন্ত্রাসী হামলার পর আন্তর্জাতিক বাজারে হিমায়িত খাদ্যের মূল রপ্তানী পণ্য চিংড়ি, বর্তমানে দেশের কক্সবাজার, খুলনা, সাতক্ষীরাসহ বিভিন্ন স্থানে আশংকাজনক কম মূল্যে বিক্রি হচ্ছে।

টেবিল-৬ঃ সন্ত্রাসী হামলার ফলে বাংলাদেশে হিমায়িত খাদ্য রপ্তানীর মূল্যমানের পতন

চিংড়ির মান	স্থানীয় বাজারে টন প্রতি মূল্য (সন্ত্রাসী হামলার পূর্বে)	বর্তমান মূল্য (সন্ত্রাসী হামলার পরে)
৩০ গ্রেড	৫ লাখ টাকা	২ লাখ ৫০ হাজার টাকা
৪৪ গ্রেড	৪ লাখ টাকা	১ লাখ ৮০ হাজার টাকা
৬৬ গ্রেড	২ লাখ ৮০ হাজার টাকা	১ লাখ ২০ হাজার টাকা
৯৮ গ্রেড	১ লাখ ৯০ হাজার টাকা	৯০ হাজার টাকা

(সূত্রঃ বাংলাদেশ ফ্রজেন ফুডস্ এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশান) প্রথম আলো,নভেম্বর ২১, ২০০১

রপ্তানী হ্রাসজনিত ক্ষতির সঠিক পরিসংখ্যান পাওয়া না গেলেও সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীরা দীর্ঘমেয়াদী ব্যবসায়িক ক্ষতির সম্মুখীন হবেন বলে আশংকা ব্যক্ত করছেন। স্বাধীনতা উত্তরকালে ২শ' কোটি টাকা থেকে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে এই অর্থবছরে রপ্তানী আয়ের এ খাতটি দাঁড়িয়েছে প্রায় ১৯শ' কোটিতে।[১৯] ব্যবসায়ী ও রপ্তানীকারকদের সূত্রে জানা গেছে, বর্তমানে দেশে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্রের অনুমোদন প্রাপ্ত হিমায়িত চিংড়ী রপ্তানী কারখানা রয়েছে ৪৮টি। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দেশের প্রায় ১কোটি লোক জীবিকা নির্বাহ করতো চিংড়ি শিল্পের ওপর। সন্ত্রাসী হামলার ফলে ইতিমধ্যেই বিশটি কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে এবং তাতে করে ব্যাপক সংখ্যক লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।। চিংড়ি রপ্তানী হ্রাস পেয়েছে ৪০ শতাংশ থেকে ৪৫ শতাংশ এবং বেকার হয়ে পড়েছে দেড় লাখ শ্রমিক। ফলে দেশে চিংড়ির বর্তমান উৎপাদন কমে গিয়ে দাঁড়িয়েছে মাত্র ১ লাখ ৭০ হাজার মেট্রিক টন।[২০]

এই সামগ্রিক নিম্নমুখী প্রবণতা রোধে যদি আরও ব্যবস্থা নেয়া না হয় তবে বাংলাদেশের চিংড়ির অবশিষ্ট বাজারও যে ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড ও মালেশিয়ার মত দেশ দখল করে ফেলবে এতে কোন সন্দেহ নেই।

৬.১-গ চামড়া শিল্প

বাংলাদেশের রপ্তানী শিল্পের মধ্যে চামড়া উল্লেখযোগ্য। এটি দেশের তৃতীয় বৃহত্তম বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী রপ্তানীমুখী শিল্প। বাংলাদেশে প্রায় ৩৫০টি চামড়া কারখানা থেকে বছরে প্রায় ২০ কোটি ঘণফুট চামড়া উৎপন্ন হয়, যার ১৯ শতাংশ রপ্তানী হয় যুক্তরাষ্ট্রে। এছাড়াও ইটালী, ফ্রান্স, জাপান, কোরিয়া, হংকং, জার্মানী, ব্রাজিলসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে চামড়া রপ্তানী হচ্ছে। এ শিল্পের সঙ্গে জড়িয়ে আছে প্রায় ৬৫ হাজার কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিক। ২০০০-২০০১ অর্থবছরে চামড়া সেক্টর থেকে আয় হয়েছে ১৬২৪ কোটি টাকা। সম্প্রতি টুইনটাওয়ারে বিমান হামলার ফলে বিশ্ব অর্থনীতির ছোঁয়া লেগেছে আমাদের চামড়া শিল্পেও। ফলে বিপাকে পড়েছে ট্যানারী মালিকেরা।[২১]

বাংলাদেশ ট্যানার্স এসোসিয়েশনের হিসাবে টুইনটাওয়ারে সন্ত্রাসী হামলা এবং তার পরবর্তীতে আমেরিকা- আফগানযুদ্ধে বাংলাদেশের চামড়ার মূল্য ২৫% থেকে ৩০% হ্রাস পেয়েছে। অস্বাভাবিকভাবে বিমান ও জাহাজ ভাড়া বেড়ে গেছে এবং এর সাথে যোগ হয়েছে শতকরা ১৫ থেকে ২০ ভাগ অতিরিক্ত সারচার্জ।[২২] ফলে দেশের ১০০% রপ্তানী পণ্য চামড়া শিল্পের অবস্থা আজ খুবই নাজুক।

৬.১-ঘ চা শিল্প ও চামড়া শিল্প

দেশে চায়ের উৎপাদন এ বছর লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরী হলেও এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে এসেছে রপ্তানী হ্রাস ও নিলাম বাজারে চা এর দর পতনের তীব্র সংকট তৈরীর আশংকা। চা রপ্তানীকারক দেশসমূহের মধ্যে আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের অবস্থান শীর্ষে। ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনা ও আফগানিস্তানে যুদ্ধের ফলে চা বাজারে উক্ত দু'দেশই অনুপস্থিত। ইপিবির তথ্যানুসারে আলোচ্য সময়ে রপ্তানীর পরিমাণ ও রপ্তানী আয় হয়েছে যথাক্রমে ৩.৯৩ মিলিয়ন কেজি ও ৫৩ লাখ ডলার। বিগত ২০০০-২০০১ অর্থবছরে একই সময়ে দেশে চা রপ্তানীর পরিমাণ ও রপ্তানী আয় ছিলো যথাক্রমে ৫.৭৫ মিলিয়ন কেজি ও ৭৭ লাখ ডলার।

চা-বোর্ড বলছে, ২০০০-২০০১ অর্থবছরের বাংলাদেশ আমেরিকা সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ১১২ কোটি ২১ লাখ টাকার ১৬.৬৩ মিলিয়ন কেজি চা রপ্তানী করেছে। এ সময় কেজি প্রতি চায়ের গড় মূল্য ছিলো ৬৩.৫৯ টাকা। পরবর্তীতে আফগান যুদ্ধের জের হিসাবে ২৭তম নিলামের আগ পর্যন্ত দর পতন অব্যাহত থাকে এবং ৫৪.৪৪ টাকা গড়ে প্রতিকেজি চা বিক্রি হয়েছে। অথচ দেশে বর্তমানে গড়ে প্রতিকেজি চায়ের

কেবল উৎপাদন মূল্যই ৫৮ টাকা। অর্থাৎ সংকটের চেহারা মারাত্মক রকমে অলাভজনক। আর তাই রপ্তানী কিঞ্চিত হ্রাস পেলেই চা শিল্পে নেমে আসবে অপূরণীয় বিপর্যয়।[২৩] গবেষকদের মতে, মূলতঃ যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে বিদেশী চা-ক্রেতাদের নিলাম বাজারে অনুপস্থিতির কারণে এই সংকট তৈরী হয়েছে।

৬.১-ঙ পাট ও পাটজাত পণ্য ও অন্যান্য রপ্তানী দ্রব্য

যুক্তরাষ্ট্রে সন্ত্রাসী হামলার ফলে আমাদের দেশের পাটের চাহিদা বিশ্ববাজারে হ্রাস পেয়েছে। গত অর্থবছরের তুলনায় এবারে কাঁচা পাটের রপ্তানী কমেছে শতকরা ২১ ভাগ। ইতোমধ্যেই এই রপ্তানী লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৩০ শতাংশ কম। রপ্তানীকারকগণ আশংকা ব্যক্ত করেছেন যে, অন্যান্য বছর ২০-২২ লক্ষ বেল কাঁচা-পাট বিদেশে রপ্তানী করা সম্ভব হলেও এ বছর ১২ লক্ষ বেল কাঁচা-পাট রপ্তানী করা সম্ভব হবে না।[২৪]

২০০০-২০০১ অর্থবছরে পাট ও পাটজাত দ্রব্য রপ্তানী করে বাংলাদেশ ২৯৭ মিলিয়ন ডলার আয় করেছে। Quad (যুক্তরাষ্ট্র, ইইউ, জাপান, কানাডা) হতে এসেছে মোট আয়ের ৪৪%। বর্তমান সময়ে সিন্থেটিক পণ্যের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়ে পাটজাত পণ্যের চাহিদা হ্রাস পাচ্ছে। এছাড়াও সেপ্টেম্বরের সন্ত্রাসী হামলা পাট ও পাটজাত দ্রব্য রপ্তানীর ক্ষেত্রে মরার ওপর খাঁড়ার ঘায়ের মত কাজ করছে। ২০০১-২০০২ অর্থবছরে পাট ও পাটজাত পণ্য খাতে সম্ভাব্য রপ্তানী আয় ৩৪৫ মিলিয়ন ডলার হলেও যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক মন্দার কারণে লক্ষ্যমাত্রার চাইতে আয় ১০% অর্থাৎ ৩০ মিলিয়ন ডলার হ্রাস পাবে।[২৫]

এছাড়াও সামগ্রিকভাবে যুদ্ধের কারণে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যে বাংলাদেশী অন্যান্য যে সকল পণ্যের রপ্তানী আয় হ্রাস পেয়েছে তাহলো, হস্তশিল্পজাত দ্রব্য (এটি কিঞ্চিত বৃদ্ধি পেয়েছে), রাসায়নিক দ্রব্য, বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদী, কম্পিউটার সামগ্রি ইত্যাদি এবং এ সকল ক্ষেত্রে সম্মিলিত রপ্তানী হ্রাসের মূল্যমান ৫০ মিলিয়ন ডলার।

৬.২ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ খাতের উপর সন্ত্রাসী হামলার প্রভাব

৬.২-ক আমদানী খাতে প্রভাবটা মূলতঃ পরোক্ষ

যুক্তরাষ্ট্র হতে বাংলাদেশে প্রতি বছর আমদানীকৃত পণ্যের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন খাদ্য-শস্য, খনিজ তেল, কল-কব্জা ও যন্ত্রপাতি, কম্পিউটার সামগ্রী, ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রপাতি, প্রাণিজ ও ভেষজ-তৈল ও চর্বি, রাসায়নিক দ্রব্য ও ঔষধপত্র। ২০০০-২০০১ অর্থবছরেও যুক্তরাষ্ট্র হতে ১৬৫০ মিলিয়ন ডলারের পণ্য আমদানী করা হয়েছে, কিন্তু

জুলাই-ডিসেম্বর ২০০১ অর্থ বছরে আমদানী হয়েছে মাত্র ৬২০ মিলিয়ন ডলারের পণ্য, অথচ তা গত বছরের তুলনায় ১১০ মিলিয়ন ডলার ব্যয়বহুল। কারণ, জুলাই-অক্টোবর ২০০১ এই চার মাসে আমদানী মূল্য ১৫.৫৬ শতাংশ বেশী দিতে হয়েছে।[২৬] এই বাণিজ্যিক অসমতা নিরসনের জন্য মার্কিন পণ্য আমদানীর উপর আমাদের নির্ভরশীলতা কমিয়ে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের পণ্যের উৎপাদন বাড়ানো প্রয়োজন।

৬.২-খ রেমিটেন্সের উপর প্রভাব সীমিত কিন্তু জনশক্তির প্রবাহ হয়ে পড়েছে অনিশ্চিত

বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিসংখ্যান বলছে বিশ্বমন্দা রেমিটেন্স প্রবাহ অর্থাৎ প্রবাসী বাংলাদেশীদের পাঠানো বৈদেশিক মুদ্রার প্রবাহে ততটা উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলেনি।[২৭] গত মার্চ ৬২০০২ ঢাকায় সিরডাপ মিলনায়তনে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) আয়োজিত 'বাংলাদেশের অর্থনীতি ও আসন্ন উন্নয়ন ফোরাম' শীর্ষক সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়। সিপিডির মতে, এখন পর্যন্ত রেমিট্যান্স প্রবাহে উচ্চ প্রবৃদ্ধি বজায় থাকায় এটি অর্থনীতিকে সচল রাখতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে ১১১ কোটি ৬৯ লক্ষ ডলারের রেমিট্যান্স এসেছে, যার প্রবৃদ্ধির হার ২০.৪ শতাংশ।[২৮] কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসী কর্মজীবী বাংলাদেশীরা সবচেয়ে বড় যে সমস্যার মধ্যে পতিত হয়েছেন তাহলো, স্থানীয় নিয়োগদাতাদের বিশ্বাসহীনতা। ফলে অন্যান্য মুসলিম চাকুরিজীবীদের মতো বাংলাদেশীরাও অমর্যাদাজনক গভীর অনিশ্চয়তায় দিনযাপন করছেন। অদক্ষ যে জনশক্তি ইতোমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানী করা হয়েছে তাদের অধিকাংশ চাকুরী-চ্যূত হয়ে পড়েছে এবং যারা এখনো চাকুরিতে বহাল আছে তাদের বেতন দেয়া হয়েছে কমিয়ে। অক্টোবর ২০০১ হতেই H1V- প্রফেশনাল ভিসায় মার্কিন চাকুরিতে বাংলাদেশী প্রযুক্তিবিদের নিয়োগ আপাতত বন্ধ রাখা হয়েছে। ফলে যুক্তরাষ্ট্রে দক্ষ জনশক্তি রপ্তানীর প্রবাহ অনির্ধারিত সময়ের জন্য অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে যা ভবিষ্যতে দেশের রেমিট্যান্স-এর ক্ষেত্রে গভীর প্রভাব ফেলতে পারে।

৬.২-গ পর্যটন শিল্পে এসেছে স্থবিরতা

বাংলাদেশে পর্যটন কর্পোরেশনের সূত্রানুসারে যুক্তরাষ্ট্রে সন্ত্রাসী হামলার পরপরই তাৎক্ষণিকভাবে আমেরিকা ও অন্যান্য দেশের পর্যটকদের বাংলাদেশে আসার হার প্রতিমাসে ৪৬ শতাংশ কমে গিয়েছে।[২৯] ফলে পর্যটন শিল্পের মাসিক আয় গত জুলাই ২০০১ তারিখেও যেখানে ২০ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা ছিলো ডিসেম্বর' ০১ এ আয় কমে ৯ কোটি ৪০ লাখ টাকায় এসে দাঁড়িয়েছে।[৩০]

সোনারগাঁও, শেরাটন হোটেলে পর্যটক কমে যাওয়ায় কর্মচারী ছাঁটাই-এর মতো ঘটনাও অনাকাঙ্খিতভাবে ঘটে গিয়েছে। বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের চিহ্নিত ৭৩ টি ট্যুরিস্ট স্পটে পর্যটন মোটেল, রেস্ট হাউজ, গেস্ট হাউস, রেন্ট-এ-কার-ব্যবসা, সর্বক্ষেত্রেই মন্দা ও হতাশার চিহ্ন ব্যাপক। তবে এই সন্ত্রাসী হামলার বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পে সর্বাপেক্ষা অন্যতম নেতিবাচক প্রভাব হলো ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ইন্টারন্যাশন্যাল ট্যুরিজম অর্গানাইজেশনের সদর দপ্তর সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হওয়ায় বাংলাদেশের জন্য বরাদ্দ Multilateral Tourism Development Initiatives (MTDI) প্রোজেক্টের সাড়ে বারোশো কোটি টাকার অনুদান বাতিল করা হয়েছে।[৩১] ফলে বিশ্বের সর্ব বৃহৎ ম্যানগ্রোভ বনানী ও সবচেয়ে দীর্ঘ সমুদ্র সৈকতের অধিকারী বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের শক্তিমান উত্থানের সম্ভাবনা আরো দীর্ঘায়িত হয়ে পড়লো।

৬.২-ঘ আইটি খাতের গতি প্রকৃতিতে ডিজিটাল ডিভাইডের প্রবণতা বৃদ্ধি

বিজনেস উইকের বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদনে দেখা যায় টুইনটাওয়ার হামলার ফলে মাইক্রো লেভেলে মূল ধারায় শিল্প বাণিজ্যের ক্ষেত্রে শেয়ার বাজারের দর পতনের প্রতিক্রিয়া তথ্য প্রযুক্তি ক্ষেত্রেও পড়েছে।[৩২]

পুঁজিতন্ত্রের মূলে সন্ত্রাসী হামলার এই ফলাবর্তন ধীরে ধীরে তৃতীয় বিশ্বকে ডিজিটালী উন্নত বিশ্ব হতে পৃথক করে ফেলার কর্তৃত্বকে আরো পুষ্ট করে তুলেছে। আর তাই বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার আট শিল্পোন্নত দেশে আন্তর্জাতিক টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়নের সহায়তায় কেবল উন্নত বিশ্বের তথ্য প্রযুক্তি খাতে প্রবৃদ্ধি বাড়ানোর পক্ষপাতদুষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণে আগ্রহটা একটু বেশী। তার মানে, ইন্টার কন্টিনেন্টাল সাবমেরিন ফাইবার অপটিকস্ কেবলে বাংলাদেশের ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্কের সংযুক্তির সম্ভাবনাকে ঐ সন্ত্রাসী হামলা আরো দুরে সরিয়ে দিয়েছে। কোন ট্রান্সন্যাশনাল নেটওয়ার্কিং কর্পোরেশনই বাংলাদেশের মত দরিদ্র তৃতীয়বিশ্বের দেশের এই কেবল সংযুক্তির টেন্ডার নেয়াকে লাভজনক ভাবছেনা।[৩৩] এর ফলে যতদিন না ইন্টারনেটের গতি সাবমেরিন কেবল সংযোগের মাধ্যমে দ্রুততর করা হবে, ততদিন পর্যন্ত ব্যান্ড উইথ (Band width) এর অপ্রতুলতার কারণে বাংলাদেশের স্থানীয় তথ্য প্রযুক্তিবিদগণ ই-কমার্স, ই-গভর্নেন্স ই-কর্পোরেশন, ই-মার্কেটিং নামক উচ্চতর ইন্টারনেট নির্ভর প্রযুক্তি গঠনের স্বপ্ন দেখা ছাড়া মূলত আর কিছু করতে পারছেন না।

৬.২-ঙ শিক্ষা খাতে ভিসা সমস্যা প্রবলতর হয়েছে

১১ সেপ্টেম্বর'২০০১ এর পরদিন হতেই বাংলাদেশী মেধাবী শিক্ষার্থী যারা উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে যেতে আগ্রহী; মার্কিন দূতাবাস কর্তৃক তাদের ভিসা আটকে

দেয়া এবং নতুন ভিসা নবায়ন না করার ফলে শিক্ষার্থীদের ভিসা সমস্যা ইতোমধ্যেই প্রবল আকার ধারণ করেছে। এই সুযোগে অন্ততঃ ১৩ টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা উন্নত দেশসমূহে বিশেষ করে আমেরিকায় ক্রেডিট ট্রান্সফারের সুবিধা দিতে সক্ষম, তারা ক্রেডিট প্রতি শিক্ষার্থীদের ব্যয় বাড়িয়ে দিয়ে মুনাফা লুটছে।[৩৪] তবে আশা করা যায় এই অবস্থা স্থায়ী নয় বরং স্বল্প সময়ের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষার্থীদের সহনীয় মাত্রার খরচে পড়ালেখা করার সুযোগ অবরুদ্ধ করে রাখবে।

৬.২-চ কমে গিয়েছে মার্কিন বৈদেশীক সাহায্য ও বিনিয়োগ

বাংলাদেশের অর্থনীতি মূলতঃ দাতা-আর্থিক সহায়তা-নির্ভর। ২০০২ সালের শুরুতেই বিশ্বব্যাংক বৈদেশিক ঋণের প্রশ্নে বিভিন্ন খাতে ১৯ টি রিপোর্টের মাধ্যমে ৫০০ টি শর্ত, সুপারিশ এবং নির্দেশনা জারি করেছে। এর পেছনে মূল কারণ হলো যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ কমিয়ে দেওয়া।[৩৫]

সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আমেরিকার সামরিক সুবিধার জন্য বাংলাদেশের স্থল, নৌ ও বিমান বন্দর ব্যবহারের প্রশ্নে কূটনৈতিক বিতর্ক এবং গ্যাস রপ্তানী ও মার্কিন বিনিয়োগে চট্টগ্রাম বন্দরে বেসরকারি কন্টেইনার নির্মাণ-প্রজেক্টের প্রশ্নে বাংলাদেশ সরকারের গা-বাঁচিয়ে চলা দৃষ্টিভঙ্গি আমেরিকায় বৈদেশিক সাহায্য প্রদানের পলিসির সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

তাই সন্ত্রাসী হামলার ফলে এখন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি ও অর্থনৈতিক কূটনীতির স্বকীয়তা অক্ষুন্ন রেখেই মার্কিন বিনিয়োগে ভারতে গ্যাস রপ্তানীর প্রস্তাব পুনঃ মূল্যায়ন করতে বাধ্য হওয়ার পরিস্থিতি তৈরী হয়েছে। কারণ ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছরে বাংলাদেশে সর্বোচ্চ মার্কিন বিনিয়োগ ১১৭৮.৩৫ মিলিয়ন ডলারের স্থলে ২০০০-২০০১ সালের প্রথমার্ধে এই বিনিয়োগের পরিমাণ সর্বনিম্ন- মাত্র ০.০৮ মিলিয়ন ডলার।[৩৬] তাই এখন যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের তৈরী পোষাকের শুল্ক ও কোটামুক্ত প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ সরকারকে আরো কৌশলী ও মনোযোগী হওয়ার প্রশ্ন তর্কাতিত। তবে তা যে কোন মূল্যে নয়।

৬.২-ছ জনশক্তি রপ্তানী খাত

বাংলাদেশের রপ্তানী খাতের মধ্যে অন্যতম একটি খাত হলো জনশক্তি। প্রতিবছর বাংলাদেশ জনশক্তি রপ্তানী করে প্রচুর পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। বিশ্বে অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দেয়ায় দেড়-দুই বছর আগে থেকেই বিদেশে জনশক্তি রপ্তানী কমে আসছিল। ১১ সেপ্টেম্বরের ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলার পর এখাতে রীতিমত ধ্বস নামে। ঐ ঘটনার পর বাংলাদেশ থেকে কোনো শ্রমিক বিদেশের কোনো দেশে প্রায় যায়নি বলা চলে। ১১ সেপ্টেম্বরের পর জনশক্তি রপ্তানীর নতুন কোনো চুক্তি সই হওয়া দূরের কথা পূর্বে স্বাক্ষরকৃত চুক্তিগুলোর বেশিরভাগই বাতিল হয়ে যায়।

এমনিতেই যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ থেকে জনশক্তি রপ্তানীর পরিমাণ কম। ইন্দোনেশিয়া, মালোয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুর বাংলাদেশী জনশক্তি রপ্তানীর একটি বড় বাজার। কিন্তু ১১ সেপ্টেম্বরের সন্ত্রাসী হামলার পর বিশ্বব্যাপী মন্দার যে প্রবাহ সৃষ্টি হয়েছে, এর ঢেউ আছড়ে পড়েছে এসব দেশগুলিতেও। বহু নির্মাণ কাজ এখন বন্ধ। নতুন জনশক্তি রপ্তানী তো দূরের কথা যারা গেছে ইতোমধ্যেই তাদের অনেকে কাজ পাচ্ছে না। ২০০০ সালের জুন মাস পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে চাকুরি নিয়ে বিদেশে গমণকারীর সংখ্যা ছিল ১২৫১৬৭ জন। আর ২০০১ সালের একই সময় রপ্তানী হয়েছে ১৮১৮৯৭ জন।[৩৭] এ থেকেই জনশক্তি রপ্তানীর দৈন্যদশা চোখে পড়ে। যদিও সরকার আশা করছে ২০০১-২০০২ অর্থবছরেই তারা জনশক্তি রপ্তানীর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করবে যা হয়তো সুদূরপরাহত।

৭. এই সামগ্রিক সংকট কাটিয়ে ওঠার জন্য করণীয়

মার্কিন অর্থনীতির ভিত বিশ্বব্যাপী ও অত্যন্ত মজবুত হওয়ার কারণে যুক্তরাষ্ট্র একদিন তাদের বিপর্যস্ত অর্থনীতির দাপট পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হবে। কিন্তু বিশ্ব মন্দার ঘূর্ণিঝড়ে বিশৃংখল হয়ে পড়া বাংলাদেশের অর্থনীতির এখন প্রয়োজন কার্যকর ইকোনোমিক পলিসি গ্রহণ করা এবং তার চেয়ে বেশী প্রয়োজন দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আনয়ন করে বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিবেশ তৈরী করা ও স্থানীয় রপ্তানী পণ্যের উৎপাদন ও মান বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি করা। এ লক্ষ্যে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা বিবেচনা করা যেতে পারে,

ক. রপ্তানী পণ্যসমূহকে অধিক প্রতিযোগিতামূলক করে তোলার জন্য রপ্তানী ঋণের সুদের হার ৮% এর নিচে নির্ধারণ করা যেতে পারে।

খ. আমদানী ও রপ্তানী পণ্যে লীড টাইম হ্রাসের লক্ষ্যে বন্দরের কার্যক্ষমতাবৃদ্ধি আবশ্যক। সেক্ষেত্রে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ এবং রপ্তানীমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুত সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।

গ. পণ্যের উন্নয়ন ও পণ্য বহুমুখীকরণ অত্যাবশ্যক। একই সঙ্গে উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি অনেক সুবিধা বয়ে আনে। তাই পণ্যের গুণগত মান উন্নয়নপূর্বক উচ্চমূল্যের বাজারে প্রবেশ প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে।

ঘ. প্রয়োজনে স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে সঙ্গে নিয়ে গার্মেন্টস্ শিল্পের কোটামুক্ত ও শুল্কমুক্ত বাজার সুবিধা আদায়ের বিষয়টি জোরদার করতে হবে।

ঙ. রপ্তানী বাণিজ্যকে আরো অধিক মাত্রায় উৎসাহিত করার জন্য রপ্তানীকারকদের জন্য ব্যাংক সুদের হার কমাতে হবে। এক্ষেত্রে ভারতের উদাহরণ ব্যবহার করা যেতে পারে। গত অক্টোবর, ২০০১ থেকে ভারতের

রিজার্ভ ব্যাংক রপ্তানীকারকদের জন্য ব্যাংক সুদের হার ১ শতাংশ কমিয়ে দিয়েছে।[৩৮]

চ. গুরুত্বপূর্ণ খাতসমূহের পাশাপাশি সম্ভাবনাময় বেশকিছু ননট্রেডিশনাল শিল্পখাত যেমন, সফ্টওয়্যার এবং ডাটা প্রসেস, লেদার এন্ড লেদার গুডস্, এগ্রোবেজড্ ইন্ডাষ্ট্রি, লাইট ইনজিনিয়ারিং ইলেকট্রনিকস্, জুয়েলারী গ্যাস বেইজ ইন্ডাষ্ট্রিজ ইত্যাদি খাতে রপ্তানী বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে যাতে রপ্তানী বহুমুখী করা যায়।

ছ. বিদেশে আমাদের উজ্জ্বল ভাবমূর্তি তুলে ধরা প্রয়োজন। বিষয়টি শুধু অর্থনৈতিক নয়। বিশ্বায়নের প্রক্রিয়ার সুযোগ-সুবিধা পেতে হলে আমাদেরকে একটি সুশাসিত, দুর্নীতিমুক্ত, আধুনিক ও অসাম্প্রদায়িক জাতি হিসেবে আমাদের ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

জ. উন্নততর টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে বিশ্ব অর্থনৈতিক কেন্দ্রসমূহের সংগে আমাদের ভৌগলিক দূরত্বের অসুবিধা যথাসম্ভব লাঘব করতে হবে।

ঝ. রপ্তানী খাত বিকাশের জন্য আমাদের স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় চলমান বিশ্বমন্দাবস্থা কাটিয়ে উঠলেও ২০০৪ সালের পর কোটামুক্ত অবাধ রপ্তানী বাণিজ্যে টিকে থাকা সম্ভব হবে না।

ঞ. শিল্পোন্নত দেশের শিল্প উদ্যোক্তাদের সাথে প্রয়োজনে জয়েন্ট ভেনচার কোম্পানী গড়ে তোলা যেতে পারে।

ট. সর্বোপরি আমাদের দেশে প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ে ঐক্যমত সৃষ্টি করা আশু প্রয়োজন। এ বিষয়টি নিশ্চিত করা সম্ভব না হলে আমাদের দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারণাটি কাগুজে ধারণাই থেকে যাবে-বলা যায়।

পরিশেষে এসব পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ, পুঁজিবাদের বিশ্বায়ন, ক্ষুধা, দারিদ্র ও অনুন্নয়নের সকল চ্যালেঞ্জকে মোকাবেলা করার জন্য বাংলাদেশ একবিংশ শতাব্দীর উপযুক্ত হাতিয়ার হিসাবে সুদৃঢ় ও গতিশীল অর্থনীতিকে ভিত্তি করে একদিন সফল জাতি হিসাবে মাথা তুলে দাঁড়াবে সেই সময়ই এখন আমাদের অপেক্ষার গন্তব্য।

৮. উপসংহার

১১ সেপ্টেম্বর- এর সন্ত্রাসী হামলায় সারা বিশ্বে যে অর্থনৈতিক প্রতিক্রিয়ার সূত্রপাত ঘটে; বিশ্বায়নের বাস্তবতায় এই প্রতিক্রিয়ার ধাক্কা বাংলাদেশের ওপরও পড়েছে। গোটা বিশ্বের অর্থনীতি এখন অতিক্রম করছে সবচেয়ে বেশী অনিশ্চিত সময়। বাংলাদেশের অর্থনীতি মূলত নির্ভর করছে বিভিন্ন রপ্তানীজাত দ্রব্যের ওপর। সেপ্টেম্বরের হামলার পরিপ্রেক্ষিতে রপ্তানীজাত পণ্যগুলোর রপ্তানী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে নানাভাবে। যেভাবেই হোক এ অবস্থা অতিক্রম করতে হবে। এ দুরবস্থা কেটে ওঠার জন্য বহুমুখী রপ্তানী ছাড়া কোনো পথ খোলা নেই। আর যেভাবেই হোক যুক্তরাষ্ট্রে শুল্ক ও কোটামুক্ত গার্মেন্টস পণ্য প্রবেশাধিকার পাওয়ার ব্যাপারটি নিশ্চিত করতে হবে। আলোচনা থেকে এ-বিষয়টি স্পষ্ট করে বলা যায় যে, যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থাপনায় সন্ত্রাসী হামলার ফলে বাংলাদেশের রপ্তানী খাতে বিপর্যয় ঘটেছে। সন্ত্রাসী হামলার ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে যে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে- সে সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসা বেশ জরুরী। অর্থনৈতিক এ-সমস্যা সমাধানে জাতীয় ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠাসহ অর্থনীতিকে সচল রাখার সব ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা গেলে আমাদের দেশের অর্থনীতির মন্দার প্রভাব কাটিয়ে উঠা খুব একটা কঠিন হবে বলে মনে হয় না।

তথ্য-সূত্র

১. http://www.mce.be/membership/articles/january1.htm

২. দৈনিক ইত্তেফাক, জানুয়ারী ১৪, ২০০২

৩. DCCI Seminar Key-note Paper, Terrorist Attacks in USA : Impact on Bangladesh Economy, Page-4, Dhaka

৪. ডিসিসিআই গবেষণা খসড়া, বিশ্ব অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বাংলাদেশের রপ্তানীতে সম্ভাব্য প্রভাব ও সুপারিশ, পৃষ্ঠা-১

৫. DCCI Annual Report- ২০০১

৬. News week, Economic Shock waves, Sept 29, 2001, Page-60

৭. ব্যাংকার, বিশ্ব অর্থনীতির মন্দা, অক্টোবর-২০০১ সংখ্যা, পৃষ্ঠা-২৯

৮. ব্যাংকার, বর্ষ-১৩, সংখ্যা-২, পৃষ্ঠা-২৩

৯. বাংলাদেশ বিনিয়োগ বোর্ড, বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০০১

১০. দৈনিক জনকণ্ঠ, জানুয়ারী ১২, ২০০২

১১. BIISS Monthly Review. The Donors and the Bangladesh Economy. Nov` 01, Dhaka.

১২. ব্যাংকার, বর্ষ-১৩, সংখ্যা-২, পৃষ্ঠা-২৩

১৩. ব্যাংকার, একুশ শতকের অর্থনীতিঃ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট-২০০২, মার্চ, ২০০২, পৃষ্ঠা-১৫

১৪. DCCI Seminar Key-note, Page-10

১৫. Dhaka Courier, Effect of Terrorist Attacks on Twin Tower: How Real is Crisis in Garments Units? 14 Dec`2001, Page-10

১৬. দৈনিক সংবাদ, আমেরিকায় ডিউটি ও কোটামুক্ত গার্মেন্টস রপ্তানী, ২৫ অক্টোবর, ২০০১

১৭. দৈনিক জনকণ্ঠ, ফেব্রুয়ারী ২, ২০০২

১৮. দৈনিক সংবাদ, নভেম্বর ২৫, ২০০১

১৯. সাপ্তাহিক ২০০০, ডিসেম্বর ১৪, ২০০১, বর্ষ-৪, সংখ্যা-২৬

২০. ব্যাংকার, দেশের হিমায়িত খাদ্য রপ্তানীতে অশনী সংকেত, জানুয়ারী ২০০২ সংখ্যা

২১. সাপ্তাহিক ২০০০, মার্চ ১,২০০২ বর্ষ-৪, সংখ্যা-৪১

২২. সাপ্তাহিক ২০০০, চামড়া শিল্পে সংকট, ১ মার্চ ২০০২ সংখ্যা।

২৩. ব্যাংকার, জানুয়ারী ২০০২, বর্ষ-১৩, সংখ্যা-২, পৃষ্ঠা-২৯

২৪. দৈনিক জনকণ্ঠ, জানুয়ারী ৩০, ২০০২

২৫. DCCI Recommendations research Draft

২৬. The Daily Star. The impact of World wide Recession and the Import Sustainity in Bangladesh, 3 Jan 2002.

২৭. দৈনিক প্রথম আলো, ২৮ নভেম্বর' ২০০১

২৮. দৈনিক প্রথম আলো, 'অর্থনীতির বিপর্যয় কাটাতে জরুরী পুনরুদ্ধার কর্মসূচির তাগিদ' মার্চ ৭, ২০০১

২৯. Digonto, Biman Bangladesh Airlines In-flight Magazine. Oct-Dec 2001, Page-21.

৩০. দৈনিক যুগান্তর, ১৫ জানুয়ারী-২০০২

৩১. www.bpcbd.com, বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন ওয়েব সাইটের প্রতিবেদন

৩২. কম্পিউটার জগত, আইটি খাতের বিপনন মন্দা- নভেম্বর'০১ পৃষ্ঠা-২৯

৩৩. ই-বিজ, বৃত্তাবন্দি প্রযুক্তি বিশ্বের মন্দাভাব কাটবে কী? ডিসেম্বর'২০০১

৩৪. তথ্যে বাংলাদেশ, ইনফরমেশন এন্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট জার্নাল, জানুয়ারী, ২০০২

৩৫. BIISS Monthly Review, The Donors and Bangladesh Economy, Nov`2001

৩৬. DCCI Seminar Keynote Paper, Terrorist Attacks in USA: Impact on Bangladesh Economy, Page-10, Dhaka

৩৭. দৈনিক ইত্তেফাক, ডিসেম্বর ১২, ২০০১

৩৮. দৈনিক প্রথম আলো, বর্তমান আফগান যুদ্ধ ও বাংলাদেশ', অক্টোবর ১২, ২০০১, পৃষ্ঠা-৬

লেখকদের জন্য জ্ঞাতব্য

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা (ইতোপূর্বেকার ষাণ্মাসিক প্রশাসন সমীক্ষা) বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের বাৎসরিক বাংলা সাময়িকী। প্রতি বাংলা সনের কার্তিক মাসে এ'টি প্রকাশিত হয়। এতে সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ক মৌলিক ও গবেষণামূলক নিবন্ধ, গবেষণা টীকা ও পুস্তক সমালোচনা মুদ্রিত হয়ে থাকে। তবে লোক-প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা ও প্রশিক্ষণ বিষয়ক লেখা অধিক গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হয়।

- প্রবন্ধটি মৌলিক এবং অন্য কোন জার্ণাল বা সাময়িকী, সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়নি বা প্রকাশের জন্য প্রেরিত হয়নি, এ মর্মে প্রবন্ধ জমা দেয়া বা প্রেরণের সময় একটি লিখিত বিবৃতি প্রদান করতে হবে।
- লেখা মান সম্পন্ন সাদা কাগজে (রিপোর্ট সাইজ) পর্যাপ্ত মার্জিন রেখে এক পৃষ্ঠায় ১২ ফন্টে ডাবল স্পেসে কম্পিউটারে মুদ্রিত হতে হবে। মূল পাণ্ডুলিপির সঙ্গে অবশ্যই কম্পিউটার ডিস্কেটে প্রবন্ধ প্রেরণ করতে হবে। কম্পিউটার কম্পোজের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত ফন্টের ব্যবহার অনুসরণ করতে হবেঃ
- বাংলা কম্পোজ ঃ "বিজয়-সুতন্নি এমজে" ফন্ট।
- ইংরেজী কম্পোজ ঃ "টাইমস নিউ রোমান" ফন্ট।
- প্রেরিতব্য কম্পিউটার ডিস্কেটের কভারে লেখকের নাম, লিখিত প্রবন্ধের নাম এবং সংশ্লিষ্ট ফাইলের নাম উল্লেখ করতে হবে।
- প্রবন্ধে বাংলা একাডেমী অনুমোদিত বানান পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।
- মূল কপিসহ পাণ্ডুলিপির ২ (দুই) প্রস্ত (পরিচ্ছন্ন কপি) সম্পাদকের বরাবরে পাঠাতে হবে। প্রবন্ধের উপর আলাদা কাগজে (কভারপেজ) প্রবন্ধের শিরোনামসহ লেখকের নাম, পদবী ও ঠিকানা উল্লেখ করতে হবে, প্রবন্ধের কোথাও লেখকের নাম উল্লেখ করা যাবে না।
- ভিন্ন কাগজে লেখকের সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত প্রবন্ধের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।
- প্রত্যেক লেখার সাথে অবশ্যই প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তসার (Abstract) ইংরেজীতে অনধিক ১৫০ শব্দের মধ্যে প্রেরণ করতে হবে।
- প্রবন্ধের পাদটীকায় ও তথ্যপঞ্জিতে লেখক, গ্রন্থ স্থান, প্রকাশক, বছর ও পৃষ্ঠা এবং সাময়িকীর ক্ষেত্রে লেখক, প্রবন্ধের নাম, সাময়িকীর নাম, খণ্ড ও ইস্যু সংখ্যার বছর ও পৃষ্ঠা প্রচলিত প্রমিত নিয়ম (Standard) অনুসারে উল্লেখ করতে হবে।
- লেখা প্রকাশিত হলে লেখক সাময়িকীর ২ কপি ও প্রবন্ধের ২৫কপি অনুলিপি বিনামূল্যে পাবেন।
- প্রাপ্ত প্রবন্ধটি প্রকাশের ক্ষেত্রে সম্পাদনা পরিষদের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে এবং অমনোনীত প্রবন্ধ ও ডিস্কেট সাধারণত লেখককে ফেরৎ দেয়া হয় না, তবে বিশেষ প্রয়োজনে ফেরৎ পেতে হলে এতদ্সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয়ভার লেখককে বহন করতে হবে।
- মুদ্রিত প্রবন্ধের ক্ষেত্রে প্রতি মুদ্রিত পৃষ্ঠার (৩০০ শব্দের পৃষ্ঠা) জন্য লেখককে ২০০ (দুইশত) টাকা হারে সম্মানী প্রদান করা হবে।

প্রকাশনা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং ইছামিত অফসেট প্রেস, ১/১ ডি.আই.টি রোড, হাজীপাড়া, ঢাকা-১২১৭ থেকে মুদ্রিত।